প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১৪শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ৫ জমা. সানি, ১৪৪১ হিজরি | ৩১ সুলাহ্, ১৩৯৯ হি. শা. | ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ ঈসাব্দ

মুক্তিপ্রাপ্ত আসিরানে রাহে মওলাগণকে সংবর্ধনা

বামে জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী এবং ডানে জনাব মোহাম্মদ আলী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী এবং তালশহর জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেবকে গত ১৪ই জানুয়ারী ২০২০ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া হয়। জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরীর স্থায়ী নিবাস হবিগঞ্জ জেলার জামালপুর গ্রামে। প্রায় ৪০ দিন কারাবাস ও দীর্ঘ ৮ বছর আদালতে আইনি লড়াই শেষে গত ১৩ই জানুয়ারী ২০২০ তিনি আদালত থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

ঘটনার পটভূমি হল, গত ২০১২ সালের ১৬ই অক্টোবর বিকেলে হবিগঞ্জের মাধবপুরে ফায়ার সার্ভিসের ফায়ারম্যান হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় একদল উগ্রপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠী ফায়ার সার্ভিসের মূল ভবন ঘেরাও করে জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরীকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। তার একমাত্র অপরাধ, তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। তাকে হত্যা করার মানসিকতা নিয়ে আগত এই উগ্র-মোল্লাদের মূল উস্কানিদাতা ছিলেন মাধবপুর থানা মসজিদের ইমাম মৌলভী শফিকুল ইসলাম। মাইকের মাধ্যমে এই প্রোপাগাণ্ডার আরেক হোতা (মাধবপুর ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন) ইয়াকুব আলী।

উগ্র-মৌলভী সাহেবদের উস্কানিতে মাধবপুরের সহজ-সরল মানুষ যখন জনাব তৌফিক আহমদ সাহেবের ওপর বর্বরোচিত হামলার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয় তখন ঐশী কৃপায় তিনি সেখান থেকে বের হয়ে স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে উপস্থিত হন। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে উগ্রবাদীদের দ্বারা জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেবও শারীরিকভাবে নির্যাতিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হন। থানা হাজত থেকে জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরীকে ধর্ম অবমাননার সন্দেহে কারাবাসে পাঠানো হয়। ৪০ দিন তিনি কেবল ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়ে কারাবাস করেন এবং জামিনে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ ৮ বছর উক্ত মামলার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে গত ১৩ই জানুয়ারী ২০২০ তিনি আদালত থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। উভয়ের সম্মানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্রে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এতে তাঁরা নিজেদের দোয়ার কবুলিয়াত ও ঐশী সাহায্যপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ছাড়াও অনুষ্ঠানে এডভোকেট প্রিন্স সাহেবও তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

সম্পাদকীয়

‘হৃদয়ের সংশোধন তাঁরই কাজ যিনি হৃদয়ের মালিক’

সত্য হেদায়েত খোদার পক্ষ থেকে আসে; কুরআন পড়েও হতভাগারা তা বুঝেনা

আল্লাহ্ তা’লা যুগে যুগে মানবের সংশোধনকল্পে তাঁর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষদের আবির্ভূত করেছেন। বর্তমান যুগে মানুষকে অন্ধকার থেকে উদ্ধারকল্পে তিনি আপন মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন; যিনি এ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক।

খোদা তা’লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ১৮৮৩ সনে ইলহাম করেছিলেন, **‘তুবু ওয়াআসলেহ্ ওয়া তাওজ্জাহুল্লাহু’**। অর্থাৎ, ‘তওবা কর, পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত হও এবং সংশোধন করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচলভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং তাঁর সাহায্য চাও’। অর্থাৎ বর্তমান সংশোধন-যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তাঁর (আ.) আরেকটি ইলহামী দোয়া হলো, **‘রাব্বি আসলিহ্ উম্মতা মুহাম্মদিন’** অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন করো।

বর্তমানে অনেক ধর্মীয় আলেম মুসলমানদের সংশোধনের ব্যাপারে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত। পাকিস্তানের একজন নামকরা ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইসরার আহমদ সাহেব লিখেছেন, ‘গত চার’শ বছরে উম্মতের সংশোধন ও সংস্কারের কাজ মূলতঃ উপমহাদেশে হয়েছে এবং অধিকাংশ মুজাদ্দিদ এ উপমহাদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই মনে হয়, এ অঞ্চল নিয়ে খোদার কোন বিশেষ পরিকল্পনা আছে। অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ ও মাহদীর এ অঞ্চলে আসার বিষয়টি তারা অনুধাবন করে কিন্তু পরিস্কার ভাষায় তা প্রকাশ করে না।

খোদার শেষ মোজাদ্দিদ এখানে এসেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সাক্ষ্য সত্বেও তারা এদিকে কর্ণপাত করছে না। তাদের জ্ঞান, আলোকবর্তিকা হয় নি বরং হঠকারীতার ফলে তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছে। এরা নিজেরা অন্ধকারে দিশেহারা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আর একটি ইলহাম, **‘আসলেহ্ বাইনি ওয়া বাইনা ইখওয়াতী’** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করো।

চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আজও প্রত্যহ তাঁর জামা’ত বিরোধিতার সম্মুখীন। এ বিরোধিতা তাঁকে বা তাঁর জামা’তকে ধ্বংস করার জন্য নয় বরং বিরোধিতার সেই ভয়াবহ যুগে নবীর বেদনাবিধূর দোয়াকে খোদাতা’লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (সা.)-কে নিয়েও বিরোধিরা উপহাস ও হাসি-ঠাট্টা করেছে।

কিন্তু যখন তারা অত্যাচারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন খোদা তা’লা তাঁর (সা.) কাতর দোয়া শুনেছেন ফলে সীমালঙ্ঘনকারীরা লাঞ্ছনার সাথে ইহধাম ত্যাগ করেছে আর যারা অনুতপ্ত হয়েছে খোদা তাদেরকে সত্যের পতাকা তলে আশ্রয় দিয়েছেন।

আজও একই রীতি অনুসৃত হচ্ছে। মানুষ যুগ মসীহ্‌কে অস্বীকার করছে আর অপরদিকে অমুসলিমরাও সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঘৃণ্য আক্রমণ করছে আর এভাবে ঐশী শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,
‘প্রথম নিজের সংশোধন করো পরে অন্যের সংশোধনের কথা বল। সূর্য অন্যদের আলোকিত করার পূর্বে প্রথমে নিজে আলো অর্জন করেছে। অন্যকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা সম্ভব কিন্তু নিজে ত্যাগ স্বীকার করা কঠিন। তাই প্রথমে আত্ম-সংশোধন করো নতুবা তুমি নিজেও ধ্বংস হবে আর অন্যকেও ধ্বংস করবে।’

আরেক স্থলে তিনি (আ.) বলেন, ‘পাপ মুক্ত হবার জন্য অহংকার ও আত্মগরিমা পরিহার করা আবশ্যক। আভ্যন্তরীন জ্যোতি বা নূর আকাশ থেকে অবতরণ করে। ঈমান ও পবিত্রতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। বিনয়ী ও নিরহংকারী হয়েই মানুষ খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে। যদি বিনয়ী না হও তাহলে অহংকার বশে অন্যকে হেয় জ্ঞান করবে আর গালি দিবে’।

বর্তমান যুগের আলেমরা এমনই, এরা জ্ঞানের অহংকারে অন্যকে হেয় মনে করে আর গালি-গালাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘হৃদয়ের সংশোধন তাঁরই কাজ যিনি হৃদয়ের মালিক’। বড় বড় বুলি আওড়ানো যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্’কে আল্লাহ্’র মাধ্যমেই চেনা সম্ভব। যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে আর এটি বুঝে না যে, সত্য হেদায়েত খোদার পক্ষ থেকে আসে; সে কিছুই বুঝে নি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **‘মান লাম ইয়ারেফ ইমামা যমানিহী ফাক্বাদ মা’তা মিতাতাল জাহেলিয়্যাতে’**। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যমানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে।

জামাতের বাইরে অনেকেই আছে যারা সত্য বুঝে কিন্তু মানুষের ভয়ে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দিন। মানুষকে ভয় না করে খোদা প্রেরিত ইমামকে মানার সৌভাগ্য দান করুন। আমরা যারা সত্যকে মানার সৌভাগ্য অর্জন করেছি তারা যেন খোদার অনুগ্রহে নিজেকে সংশোধন করতে পারি আর একান্ত বিনয়ের সাথে যেন তাঁর প্রতি সমর্পিত হতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন!

সূচিপত্র

৩১ জানুয়ারি ২০২০

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)	৬
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ এপ্রিল ২০১৯ মোতাবেক ১৯ শাহাদত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ**	৮
আবারো গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পায়তারা মাহমুদ আহমদ সুমন	১৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল	১৮
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	২২
নিশ্চয় অস্বীকারকারীরা কখনও সফলকাম হয় না মোহাম্মদ নূরুজ্জামান	২৪
সংবাদ	২৬

Coronavirus প্রতিরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর পরামর্শ

সারা বিশ্বে **Coronavirus** দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন।

আক্রান্ত রোগীর জন্য নিম্নোক্ত তিনটি ঔষধঃ

1. **INFLUENZINUM-200, BACILLINUM-200, DIPHTHERINUM-200**
   তিনটি ঔষধ এক সাথে মিশিয়ে প্রথম এক সপ্তাহ সকালে এবং রাতে সেবন করতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে দুইবার (তিন দিন বিরতি দিয়ে)।
2. **ARNICA-30, BAPTISEA-30, ARSENIC ALB-30, HEPAR SULPH-30, NAT. SULPH-30**
   প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার সেবন করতে হবে।
3. **CHELIDONIUM MAJ-Q**
   দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমান পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন দুইবার খাবার পরে সেবন করতে হবে।

প্রতিশেধকরূপে নিম্নোক্ত দুইটি ঔষধঃ

1. **ACONITE-200, ARSENIC ALB-200, GELSENIUM-200**
   এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুইবার সেবন করতে হবে।
2. **CHELIDONIUM MAJ-Q**
   দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমান পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন একবার সেবন করতে হবে।

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪। সে বললো, 'আমি যা ভুলে গেছি এর দরুন তুমি আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না। আর আমার ব্যাপারে কঠোর হয়ে তুমি আমাকে কষ্টেও ফেলো না।'

فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـــًٔا نُّكْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫। তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো[১৭১৩]। অবশেষে তারা যখন এক বালকের[১৭১৩-ক] দেখা পেল তখন সে (অর্থাৎ মহান বান্দা) তাকে মেরে ফেললো। এতে সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি কি এমন একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে, যে কাউকে হত্যা করে নি? নিশ্চয় তুমি এক অতি মন্দ কাজ করেছো।'

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। সে বললো, 'আমি কি তোমাকে বলি নি, তুমি আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?'

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'এরপর আমি তোমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না। কারণ তুমি আমার পক্ষ থেকে ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছ।'

فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮। এরপর তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো। অবশেষে তারা যখন এক জনপদে পৌঁছলো তখন তারা এর অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা এদের আতিথেয়তা[১৭১৪] করতে অস্বীকার করলো। তারা সেখানে এক পতনোন্মুখ দেয়াল দেখতে পেল। সে (অর্থাৎ মহান বান্দা) এটি ঠিকঠাক করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি চাইলে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٩﴾

৭৯। সে বললো, 'আমার ও তোমার মাঝে এটাই বিদায়ের (সময়)। আমি এখন তোমাকে (সেসব বিষয়ের) তাৎপর্য বর্ণনা করবো, যেসব বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরে রাখতে পার নি।'

১৭১৩। 'ইনতালাকা' অর্থ তারা রওয়ানা হলো যেভাবে এই শব্দটি সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, অবিকল সেইভাবে ফিরিশতা প্রধান জিবরাঈল কর্তৃক নবী করীম (সা.)-এর জন্যও এই শব্দ তাঁর মেরাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭১৩-ক। কাশফী ভাষায় যুবক বা তরুণের অর্থ অজ্ঞতা, শক্তি এবং পশুবৃত্তির তাড়না বা আকস্মিক উত্তেজনা। মূসা (আ.) কর্তৃক কাশফে দেখা কিশোর বালককে ধার্মিক আল্লাহর বান্দা কর্তৃক হত্যার ব্যাখ্যা হলো, ইসলাম ধর্ম তাঁর অনুসারীদেরকে যৌন বাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিগুলোর প্রকৃত সংযম এবং হত্যা করার প্রয়োজনিয়তা শিক্ষা দিবে।

১৭১৪। এই আয়াতের মর্ম হতে পারে, মূসা (আ.) এবং মহানবী (সা.) ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আল্লাহর পথে সহযোগিতা কামনা করবেন, কিন্তু উভয়েই উপেক্ষিত হবেন।

হাদীস শরীফ

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত

কুরআনঃ

আর তাদের পরে যারা এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর), যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে, আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।' (সূরা আল্ হাশর : ১১)

হাদীসঃ

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে। যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখনই ঐ নিযুক্ত-ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ

ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমত: দোয়া হচ্ছে- হৃদয়ের গহীন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাকে আপন মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব, যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম জায়গা করে নেয়। ইসলাম শুধু কোন এক ব্যক্তির মুক্তির কথাই বলে না, বরং তার আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এর ফলে, যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে, সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ননা করা হয়েছে। আঁ-হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য খোদামুখী হওয়া, হেদায়াত পাওয়ার বাসনা পোষণ ও তার কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজকে ধ্বংস করে ফেলবে।" আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এর ফলে, যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে, সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচুস্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচুস্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্য ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। *(সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃ. ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৩৯তম কিস্তি)

(৫) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ এ-ই যে, (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী) আগমনকারী ইবন-মরিয়মের ষষ্ঠ সহস্রাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করা আবশ্যকীয় ছিল। কেননা, সর্বব্যাপী অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার কারণে এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃতস্বরূপ সর্বাত্মকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার দরুন আধ্যাত্মিক ধারায় (বর্তমান) মানবজাতির পিতা হযরত আদমের আকারে প্রতিশ্রুত ইবনে-মরিয়মের জন্মলাভ করা আবশ্যক ছিল। আর ইঞ্জিল ও কুরআন করীমে তাঁর আবির্ভাবকালের বৃহৎ এই চিহ্নাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, ইতোপূর্বে আধ্যাত্মিকভাবে জগৎ জুড়ে এক ফাসাদ বা বিকার ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। নক্ষত্ররাজী (রব্বানী উলামা) ঝরে যাবে। আসমানী জ্যোতির জায়গায় পৃথিবী ব্যাপী এক কম্পন ও আলোড়ন সৃষ্টি হবে। যারা প্রকৃত সত্যান্বেষী তারা স্বল্প সংখ্যকই অবশিষ্ট থাকবে। আর দুনিয়ায় স্ত্রীলোকের বিপুল বিস্তৃতি ঘটবে অর্থাৎ হীন ভোগবিলাস প্রার্থী অত্যন্ত বেড়ে যাবে। তারা ধনভাণ্ডার উদ্ঘাটনে আগ্রহী ও তৎপর হবে, কিন্তু আসমানী (আধ্যাত্মিক) রত্নভাণ্ডার অন্বেষায় বিমুখ হবে। তখন সেই 'আদম' যার অপর নাম 'ইবনে-মরিয়ম'ও বটে, তাকে (প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) কোনো মানবীয় অসিলা ছাড়া সৃষ্টি করা হবে। এ বিষয়ের দিকেই (মুসলমানদের সর্বমহলে বরেণ্য ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশংসিত) 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এ ইল্‌হামটি ইঙ্গিত করছে: **"ইন্নাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌যা কানাতা রাতক্বান ফা-ফাতাক্বনাহুমা। কুন্‌তু কানাযাম্-মাখফিয়ান ফা-আহ্‌বাব্‌তু আন উ'রাফা।"** অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী অবরুদ্ধাবস্থায় ছিল এবং অনড়-অটল পরম সত্য ও সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্বসমূহ সুপ্ত হয়ে পড়েছিল। অতএব, প্রতিশ্রুত এ ব্যক্তিকে প্রেরণ করে তা সবই উন্মুক্ত করেছি। আমি গোপন এক গুপ্তধন স্বরূপ ছিলাম। অতএব, আমি চেয়েছি যেন যথাযথভাবে পরিচিত হই।'

এই পর্যালোচনায় যেহেতু প্রতীয়মান হলো, আখেরী যুগে আগমনকারী খলীফাতুল্লাহ্ আবশ্যকীয়ভাবে 'আদম'-এর নামে আগমন করতেন। আর এটা স্পষ্ট যে, আদম (আ.)-এর আবির্ভাবকাল ছিল ষষ্ঠ দিবসের 'আসরের সময়', যেমনটি সহীহ্ হাদীসসমূহ এবং তৌরাতেও সপ্রমাণিত। কাজেই প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে মানতে হবে যে, এ আদমই সেই আদম ও ইবনে-মরিয়ম। কেননা, প্রথমত এরকম দাবী এ অধমের আগে কখনও অন্য কেউ করেন নি। আর এ অধমের এই দাবী দশ বছরকাল থেকে প্রচারিত হয়ে চলছে। যেমন, বারাহীনে আহমদীয়া-য় উক্ত সুদীর্ঘকাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে খোদা তা'লা এ অধমকে 'আদম' নামে অভিহিত করেছেন। খোদা তা'লার এটি এক পূর্ণাঙ্গীন হিকমত ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রজ্ঞা যে, উত্থাপিত এই গোলযোগপূর্ণ ঝড়-ঝঞ্ঝার দশ বছর পূর্বেই তিনি এ অধমকে 'আদম ও ঈসা' নামে অভিহিত করেছেন, যাতে করে চিন্তাশীলদের জন্য এটি নিদর্শন হয়। আর যাতে সেই বানোয়াট ও সকোপল কল্পিত ধারণা দূরীভূত হয় যা অপক্ক-অবিবেচক লোকদের মনে বাসা বেঁধেছে। অতএব, সর্বময় প্রজ্ঞাবান খোদা তা'লা এ অধমকে 'আদম ও খলীফাতুল্লাহ্' নামে অভিহিত করে এবং **'ইন্নি জায়েলুন ফিল আর্‌যি খলীফাহ্'** সংবলিত সুসংবাদ বারাহীনে আহমদীয়া-য় প্রদান পূর্বক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন তারা এই খলীফাতুল্লাহ্ আদমের আনুগত্য করে। এবং আনুগত্যকারী জামাতের বাইরে অবস্থান করে পবিত্র কুরআন বর্ণিত ইব্লিশের মতো পদস্খলিত না হয়। আর 'মান শাযযা শুয্‌যা ফিন্‌নার' (অর্থাৎ 'যে-ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়')– হাদীস বর্ণিত সাবধানবাণীর কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করেন এবং নিজেদের প্রচারিত ইল্‌হামাদির প্রকৃতস্বরূপ (এগুলোর অসারতা) অনুধান করেন। কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তারা নিজেদের অন্ধ বিশ্বাস প্রসূত ভিত্তিহীন রেখাকে 'জামাত' বলে আখ্যায়িত করে চক্ষুষ্মানদের প্রকৃত জামাত থেকে বিমুখ হয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে,

চক্ষুষ্মানদের প্রকৃত জামা'ত স্বল্পসংখ্যক হয়ে থাকে বিধায় বাহ্যদৃষ্টিতে তারা নগণ্য বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

আর এ অধমকে যে খোদা তা'লা আদমস্বরূপ নির্ধারণ করে প্রেরণ করছেন এর এই নিদর্শন সাব্যস্ত করেন যে, ষষ্ঠ দিবসের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে (আদম সৃষ্টির) সহস্রাব্দের শেষাংশে– যা (হাদীস বর্ণিত) আসরের সময়ের সদৃশ, তিনি আদমকে পয়দা করেছেন। যেমন, তিনি বলেন:

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

[(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪৮) অর্থ: 'তোমরা যা গণনা করে থাক সে অনুযায়ী নিশ্চয় কোনো কোনো দিন তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে এক হাজার বছরের সমান'। –অনুবাদক]

সেই ইবনে-মরিয়ম, ইঞ্জিল ও কুরআন করীমে যাকে আদম নামে অভিহিত করা হয়েছে আদমের ধারায় তার আবির্ভাব সহস্রাব্দের শেষ দিকে হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। অতএব, প্রথম আদমের জন্ম থেকে ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষটায় তার সদৃশ আখেরী আদম জন্মলাভ করবেন। অতএব, তিনি এই অধম যিনি যথা সময়ে জন্ম হলেন। 'ফাল্‌হামদু লিল্লাহি আলা যালিক' *(অর্থাৎ, 'এর দরুন সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই' –অনুবাদক)।*

(৬) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ হলো, 'প্রতিশ্রুত মসীহ্'-এর 'নযুল' বা অবতাণের এ চিহ্ন লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তার দুই হাতের তালু দু'জন ফিরিশ্‌তার ডানায় স্থাপন করা অবস্থায় থাকবে। এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, তাঁর ডান এবং বাঁ হাত যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ এবং আধ্যাত্মিক জ্যোতি আহরণের উপায়স্বরূপ আসমানে আল্লাহ্-নিযুক্ত কার্যনির্বাহক ফিরিশ্‌তাদের উপর নির্ভরশীল হবে। অতএব, মাশায়েখ ও (তাদের) কিতাবাদির সুবাদে নয়, বরং তিনি 'ইল্‌মে লাদুন্নি' তথা 'সরাসরি আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান' এবং জীবন নির্বাহে আবশ্যকীয় প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাপকও আল্লাহ্ তা'লাই হবেন– যেমন কিনা বিগত দশ বছরকাল অবধি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে এই ইলহাম প্রকাশিত হয়েছে: **"ইন্নাকা বি-'আইউনিনা সাম্‌মাইতুকাল্ মুতাওয়াক্কিল"** অর্থাৎ, 'তুমি আমার চোখের সামনে সার্বিক রক্ষাণাবেক্ষণে রয়েছে। আমি তোমাকে 'মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল) বলে অভিহিত করেছি এবং নিজ সান্নিধান থেকে শিখিয়েছি।' স্মর্তব্য যে, হাদীসে বর্ণিত 'ফিরিশ্‌তার ডানার' দ্বারা মেধা ও প্রতিভা বুঝায়। যেমন, 'মিশকাত'-এর শরাহ বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ 'লামাআত'-এর প্রণেতা নিম্নবর্ণিত হাদীসসহ এর ব্যাখ্যায় এটাই লিখেছেন: **"আন যাইদ-ইব্‌নে-সাবিত ক্বালা ক্বালা রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুবা লিশ্‌শাম ক্বুলনা লি-আইয়ে যালিকা ইয়া রসূলুল্লাহি ক্বালা লি আল্লা-মালায়য়িকাতুর্ রহমান বাসিতাতুন্ আজনিহাতা হা আলাইহা রাওয়াহু আহমাদু ওয়াত্ তিরমিযি।"** বহু সংখ্যক হাদীস এবং কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত ও তাওয়াক্কুলকারীর মর্তবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তার 'খিদমত' বা সেবায় ফিরিশ্‌তাদের নিয়োজিত করা হয় এবং প্রত্যেক ফিরিশ্‌তা স্বীয় পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সেবা করে থাকেন। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

(সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দাহ্ : ৩১)

খোদা তা'লা আরও বলেন:

حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৭১)* অর্থাৎ 'আমরা তাদের বহন করেছি বন-জঙ্গল ও নদ-নদীতে।' তবে এর কি এ অর্থ গ্রহণ করা উচিত যে, বাস্তবত খোদা তা'লা তাদের কোলে তুলে ফিরে বেড়ান? অতএব, অনুরূপভাবে ফিরিশ্‌তাদের ডানায় হাত স্থাপন করা' অদ্যবধি– শব্দাবলী বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে বর্ণিত হয় নি।

সারকথা এই যে, এ অধম উপরুল্লিখিত আলামত বা চিহ্নসহ প্রেরিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্-নিযুক্ত ফিরিশ্‌তাদের ডানাসমূহের ওপর এ অধমের হস্তদ্বয় রয়েছে এবং অদৃশ্য ক্ষমতাসমূহের সাহায্যে তথা ঐশী সহায়তায় বিশেষ জ্ঞানরাশী উন্মোচিত হচ্ছে। অন্ধ নয় এমন ব্যক্তি মাত্রই এই প্রকাশ্য চিহ্ন দ্বারা সত্যতার আলো প্রত্যক্ষ করবে। অপরাপরের মাঝে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে না।

(৭) এগুলোর মধ্যকার একটি প্রমাণ এ-ও যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র এ আলামত বা চিহ্ন লেখা আছে: 'তাঁর ফুৎকারে কাফির মারা যাবে।' এর অর্থ হলো, তাঁর বিরুদ্ধবাদী ও প্রত্যাখ্যানকারীগণ কোনো বিষয়েই মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। কেননা তারা তাঁর পরিপূর্ণ ও অকাট্য দলিল-প্রমাণের সম্মুখে মরেই যাবে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরুত্তর হবে –অনুবাদক)। অতএব মানুষ অচিরেই দেখবে, প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধবাদীগণ উজ্জ্বল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়ে মৃতে পরিণত হবে। *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ এপ্রিল ২০১৯ মোতাবেক ১৯ শাহাদত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

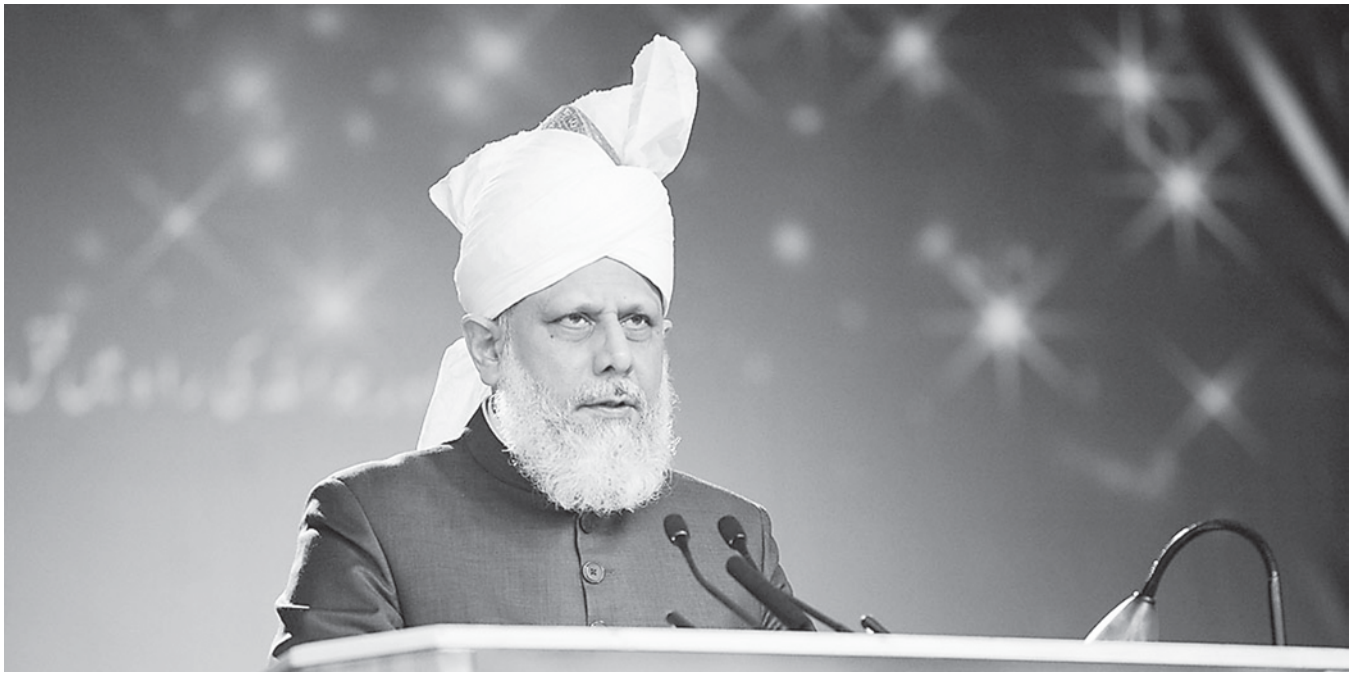

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)। তার উপনাম ছিল আবু সায়েব। হযরত উসমান (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল সুখায়লা বিনতে আম্বাস। হযরত উসমান এবং তার ভাই হযরত কুদামা (রা.) উভয়ের চেহারায় মিল ছিল। তিনি (রা.) মক্কার কুরাইশ বংশের বনু জুমাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। *(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৩০৬, উসমান বিন মাযঊন, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের যে ঘটনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী (সা.) মক্কায় নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে দেখে মুচকি হাসেন। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বসবে না? তিনি উত্তরে বললেন, কেন নয়। অতঃপর তিনি তাঁর (সা.) সামনে এসে বসে পড়েন। মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তিনি (সা.) এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তাকান। এরপর ধীরে ধীরে তিনি নিজের দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে আনেন এবং এক পর্যায়ে তিনি নিজের ডান দিকে মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, আর তাঁর সাথে বসা উসমানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে মনোযোগী হন এবং নিজের মাথা অবনত করেন। তিনি (সা.) তখন নিজের মাথা এমনভাবে নাড়ছিলেন যেন কোন কথা বুঝে নিচ্ছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) পাশে বসে এই দৃশ্য দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) যখন সেই কাজ শেষ করেন, বা যে পরিস্থিতিই বিরাজমান

ছিল তা যখন কেটে যায়; বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে, তাঁকে (সা.) কিছু বলা হচ্ছে, হযরত উসমান তা জানতেন না, কিন্তু যা-ই হোক মহানবী (সা.)-কে কিছু বলা হচ্ছিল আর তিনি তা বুঝে নেন। এরপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে, যেমনটি প্রথমবার হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি কোন কিছুর অনুসরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই জিনিস আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) পূর্বের মতো উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি অর্থাৎ উসমান (রা.) বলেন, আমি কোন্ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসব এবং বসব? হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আজ আপনি যা করেছেন, এর পূর্বে আমি আপনাকে এমনটি করতে কখনো দেখি নি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে কী করতে দেখেছ? হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, আপনার দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল। এরপর আপনি ডান দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন। আপনি আমাকে ছেড়ে সেদিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন। এরপর আপনি নিজের মাথা দুলানো আরম্ভ করেন, মনে হচ্ছিল যেন আপনাকে যা কিছু বলা হচ্ছে আপনি তা বুঝার চেষ্টা করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তুমি এমনটি অনুভব করেছ? উসমান বিন মাযঊন (রা.) বলেন, জ্বী। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এইমাত্র আমার কাছে আল্লাহ্ তা'লার দূত বার্তা নিয়ে এসেছিল যখন তুমি আমার কাছেই বসা ছিলে। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ তা'লার দূত? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তারপর সেই দূত আপনাকে কী বলল? মহানবী (সা.) বললেন, দূত আমাকে বলেছিল-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

(সূরা আন্ নাহল: ৯১)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অনুগ্রহসুলভ আচরণ এবং পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন। আর অশ্লীলতা, মন্দকর্ম এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ প্রদান করেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। উসমান বিন মাযঊন (রা.) বলেন, এটি ছিল সেই সময় যখন ঈমান আমার হৃদয়ে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে আর আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবেসে ফেলি। *(মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড পৃ. ৮০৭, হাদীস নম্বর ২৯২১, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির ঘোষণার পর প্রাথমিক যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, (দাবির) কাছাকাছি যুগে অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) হযরত তালহা, যুবায়ের, উমর, হামযা এবং উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মতো এমন সাহাবীদের পেয়েছিলেন যাদের মাঝে প্রত্যেকেই তাঁর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর (সা.) ঘামের জন্য নিজেদের রক্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৩ বছর পর্যন্ত একের পর এক বিপদাপদ ও সমস্যা এসেছে, তাঁকে (সা.) নির্যাতন ও কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন, এই মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে বুদ্ধিমান, বিবেকবান, মর্যাদাবান, তাকওয়াশীল, পবিত্র ব্যক্তিরা আমাকে গ্রহণ করেছে আর মুসলমানদের এখন একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা বলতো যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি উন্মাদ, তখন তার অপর সঙ্গী তাকে বলতো যে, তিনি যদি উন্মাদ হয়ে থাকেন তাহলে অমুক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেন তাকে মান্য করে? এটি এমন এক উত্তর ছিল যার প্রত্যুত্তর দেয়া কারো জন্য সম্ভবপর ছিল না।

ইউরোপিয়ান লেখকরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে নিজেদের পুরো লেখনীশক্তি ব্যয় করে, অনেক বিরোধিতাপূর্ণ কথা বলে, এমনকি অনেক সময় তাঁর (সা.) প্রতি নোংরা অপবাদ আরোপ করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। এখনও এসবই হয়। কিন্তু হযরত আবু বকরের নাম উচ্চারিত হলে তারা বলে, আবু বকর খুবই নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে কতিপয় ইউরোপিয়ান লেখক লিখেন যে, আবু বকর (রা.) যে ব্যক্তিকে মান্য করেছেন তিনি কীভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারেন? যদি তোমরা আবু বকরের (রা.) প্রশংসা কর তাহলে যে ব্যক্তিকে আবু বকর (রা.) মান্য করেছে সে-ও নিশ্চয় প্রশংসাযোগ্য। যদি তিনি অর্থাৎ আবু বকর নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে এমন লোভীকে তিনি কেন মান্য করেছেন। আর যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে মানতে হবে, তার মনিবও নিঃস্বার্থ ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি প্রমাণ বা যুক্তি যা প্রত্যাখান করা সহজ নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই যুক্তিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, মানুষ তাঁকে জাহেল বা অজ্ঞ বলে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই আপত্তিকে খণ্ডনের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) প্রাথমিক যুগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীও তাঁর (আ.) দাবির পূর্বে তাঁর প্রশংসাকারী ছিলেন। এরপর তিনি যখন পৃথিবীতে নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ঘোষণা করেন তখন শিক্ষিত লোকদের এমন একটি জামা'ত আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করে দিয়েছেন যারা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এই শিক্ষিত লোকেরা আলেমদের মাঝ থেকেও ছিলেন, ধনীদের মাঝ থেকেও ছিলেন আর ইংরেজী জানা লোকদের মাঝ থেকেও ছিলেন। তিনি (রা.)-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তিনটি জিনিসের মাধ্যমেই প্রভাব এবং প্রতাপের সৃষ্টি হয়। ঈমানের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে এবং সম্পদের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'লা এই তিনটি জিনিসই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। *(তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯-১৪০)*

আর তাঁকেও প্রাথমিক যুগেই এমন সব সঙ্গী বা অনুসারী দান করেছেন, জগদ্বাসী যাদের প্রশংসা করতো। বরং চিকিৎসা শাস্ত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যশ ও খ্যাতি আজও স্বীকৃত। অ-আহমদী হাকীমরাও তাঁর ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে এবং এ প্রসঙ্গে লিখে থাকে। যাহোক মহানবী (সা.)-কে তখন সমাজের সকল স্তর থেকে মান্যকারী দান করা হয়েছিল আর তারা ছিলেন বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ।

অপর এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের আক্ষেপ এবং হিংসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার ফলে কাফেরদের অন্তর সর্বদাই পুড়ে ছাই হতো আর তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না যে, এই অন্তর জ্বালা নেভানোর জন্য আমরা কী করব! এমন কোন সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল না যার সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণ করে নি। হযরত যুবায়ের (রা.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন, হযরত তালহা (রা.) সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উমর (রা.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিলেন, হযরত উসমান (রা.) সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন আস (রা.) এবং খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) (যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন) মক্কার শীর্ষস্থানীয় বংশের মানুষ ছিলেন। আস্ (অর্থাৎ আমরের পিতা) বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আমর মুসলমান হয়ে যান। ওয়ালীদ বিরোধী ছিল কিন্তু খালেদ (রা.) মুসলমান হয়ে যান। তিনি (রা.) লিখেন, "এক কথায় হাজার হাজার লোক এমন ছিল যারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততি নিজেদেরকে মহানবী (সা.)-এর চরণে সমর্পন করে আর রণক্ষেত্রে নিজেদের পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে যুদ্ধ করেছেন।" *(তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর ইথিওপিয়ায় হিজরত এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে ১৩ জনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তার পুত্র সায়েব মুসলমানদের একটি দলের সাথে ইথিওপিয়ার প্রথম হিজরতও করেছিলেন। ইথিওপিয়ায় অবস্থানকালেই তারা যখন সংবাদ পান যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে তখন তিনি (রা.) মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের কাছে যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কাবাসীর সিজদা করার সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সেখান থেকে যাত্রা করেন। ইতোপূর্বে অর্থাৎ বিগত খুতবাগুলোতে আমি এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। তার সাথে আরো লোক ছিল (তারা ভাবল) এই সিজদার কী কারণ ছিল? তাদের ধারণা ছিল, কাফেরদের সবাই হয়তো মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য অবলম্বন করেছে। কিন্তু তারা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছার পর আসল ঘটনা জানতে পারেন, তাই তখন তাদের কাছে ইথিওপিয়ায় ফিরে যাওয়াটা কঠিন মনে হচ্ছিল। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের কেউ কেউ সেখান থেকেই ইথিওপিয়ায় ফিরেও গিয়েছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, কারো নিরাপত্তার আশ্রয় নেয়া ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে যারা ভয় পাচ্ছিলেন তারাও চলে গিয়েছিলেন। যাহোক যারা সেখানে পৌঁছে ছিলেন তারা কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি তাদের প্রত্যেকেই মক্কাবাসীদের কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা কারো না কারো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা গ্রহণ করেন অথবা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুকালের জন্য পথিমধ্যেই অবস্থান করেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন দেখেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কষ্ট পাচ্ছেন, মানুষ তাদেরকে মারধর করছে, তাদের ওপর অত্যাচার করছে আর তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয়ে আরামের সহিত জীবনযাপন করছেন। ওয়ালীদ মক্কার কাফের নেতাদের একজন ছিল আর সে অমুসলিম ছিল; তিনি তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় উসমান (রা.) বলেন, খোদার কসম! এক মুশরিকের আশ্রয়ে আমি নিরাপদে জীবনযাপন করছি অথচ আমার বন্ধু এবং পরিবারবর্গকে খোদার পথে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। নিশ্চয় আমার মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, নিজেকে সম্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। অতএব তিনি (রা.) ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র কাছে গিয়ে বলেন, হে আবু আবদে শামস! (এটি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র উপাধি ছিল) তোমার দায়িত্ব শেষ। আমি তোমার আশ্রয়ে ছিলাম কিন্তু এখন আমি এই আশ্রয় প্রত্যাহার করে মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতে চাই, কেননা আমার জন্য মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তখন ওয়ালীদ বলে, হে আমার ভাতিজা! ওয়ালীদ তার পিতার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তাই সে বলে, হে আমার ভাতিজা! আমার নিরাপত্তার কারণে হয়ত তোমার কোন কষ্ট হয়েছে অথবা অসম্মান হয়েছে (তাই না)? এ কথা শুনে তিনি (রা.) বলেন, না কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বা আশ্রয়েই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তোমার আশ্রয় প্রত্যাহার করছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সন্তুষ্ট আছি আর তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছেই আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি না। তখন ওয়ালীদ বলে, চলো কাবাগৃহে যাই আর সেখানে গিয়েই ঘোষণার মাধ্যমে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দাও যেভাবে আমি ঘোষণা দিয়ে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। হযরত উসমান (রা.) বলেন, চলুন। অতঃপর তারা উভয়ে কাবাগৃহে যান। ওয়ালীদ জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে বলে, এ হলো উসমান (রা.), যে আমাকে আমার নিরাপত্তার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে এসেছে। উসমান (রা.) বলেন, সে সত্য বলছে। নিশ্চয় আমি তাকে অর্থাৎ এই আশ্রয়দাতা ওয়ালীদকে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে

সম্মানিত পেয়েছি। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আশ্রয়েই থাকতে চাই না। তাই ওয়ালীদকে আমি তার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছি। এরপর হযরত উসমান (রা.) ফিরে যান। *(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯-৫৯০, 'উসমান বিন মাযঊন', দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

ইথিওপিয়ার এই হিজরতের কথা পূর্বেও বিভিন্ন সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় আমি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এসব কথা ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতির বরাতে লিখেছেন। তিনি (রা.) লিখেন, যখন মুসলমানদের কষ্টের সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক আর তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। হাবশা নামের এ দেশটিকে ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া বলা হয়ে থাকে। এটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে দক্ষিণ আরবের ঠিক উল্টো দিকে এর অবস্থান আর উভয় দেশের মাঝে লোহিত সাগর ছাড়া আর কোন দেশ নেই। সে যুগে ইথিওপিয়ায় একটি শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাজত্ব ছিল। সেখানকার বাদশাহ্‌র উপাধী ছিল নাজ্জাশী, বরং এখনো পর্যন্ত সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে এ নামেই ডাকা হয় (অর্থাৎ যখন তিনি এটি লিখেছিলেন তখনকার কথা হচ্ছে)। ইথিওপিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন নাজ্জাশী বা বাদশাহ্‌র নিজের নাম ছিল আসহামাহ্, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বিচারক, বিবেকবান এবং শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন। যাহোক, মুসলমানদের দুঃখকষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছালে মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে অর্থাৎ নবুয়তের দাবির পাঁচ বছর পর ১১জন পুরুষ এবং ৪জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নামগুলো হলো- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং তাঁর সহধর্মিণী রসূল (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আল আউয়াম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রা.), হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.), হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) আর তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.)। তিনি (রা.) লিখেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রাথমিক এই হিজরতকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্য ছিলেন আর দুর্বলরা কমই চোখে পড়ে। এ থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়। প্রথমত শক্তিশালী গোত্রের অন্তর্ভুক্তরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বল লোকেরা, অর্থাৎ কৃতদাস শ্রেণির মানুষ তখন এতই দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিল যে, তাদের হিজরত করার সামর্থ্যও ছিল না। *[হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' এর ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত]*

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর ভাষায় এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন; হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)'র মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ এবং এরপর লাবীদ বিন রাবিআ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) লিখেন, (এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি ওয়ালীদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন) মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) একদিন তাঁর সাথিদের ডেকে পাঠান এবং বলেন, পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপারে একটি ভূখণ্ড রয়েছে যেখানে খোদা তা'লার ইবাদতের কারণে অত্যাচার করা হয় না। ধর্ম পরিবর্তনের কারণে মানুষকে হত্যা করা হয় না। সেখানে একজন ন্যায়বিচারক বাদশাহ্ আছেন। তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যাও। হয়ত (এর ফলে) তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। কতিপয় মুসলমান নারী-পুরুষ এবং শিশু তাঁর (সা.) এই নির্দেশে ইথিওপিয়ার অভিমুখে গমন করে। তাদের মক্কা থেকে বের হওয়া কোন সামান্য বিষয় ছিল না। এর সাথে আবেগের সম্পর্ক ছিল। নিজের দেশ পরিত্যাগ করা সাধারণ কোন বিষয় ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেদেরকে কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করত। আর মক্কা ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া তাদের জন্য এক অসহ্য বেদনা ছিল। মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো-এ কথা কেবল সেই ব্যক্তিই বলতে পারতো যার এ পৃথিবীতে অন্য আর কোন ঠিকানা নেই। কাজেই, তাদের মক্কা ত্যাগ করা খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। আর তাদেরকে বেরও হতে হয়েছে অতি সংগোপনে। কেননা তারা জানতেন, যদি মক্কাবাসীরা জানতে পারে তাহলে তারা আমাদের বের হতে দেবে না। আর এ কারণে তারা তাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের সাথে শেষ সাক্ষাৎ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সাথে দেখা করে যাওয়ার সুযোগও তারা পান নি, তারা গোপনে বের হয়েছিলেন। তাদের হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তা-তো ছিলই। তাদেরকে যারা দেখেছে তারাও তাদের অবস্থায় ব্যথিত না হয়ে পারে নি। সেসব অনাত্মীয় যারা হিজরতের কথা জানতে পারে, তারাও তাদের এ অবস্থায় ব্যথিত ছিল। অতএব, এই কাফেলা যখন বের হচ্ছিল তখন হযরত উমর (রা.), যিনি তখনও অবিশ্বাসী ছিলেন আর ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন, আর মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; দৈবক্রমে এ কাফেলার কতক ব্যক্তির দেখা পান। তাদের মাঝে উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা.) নামের একজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) যখন গাটরি-বোচকা ও প্রস্তুতকৃত বাহন দেখেন তখন তিনি বুঝতে পারেন, এরা মক্কা ছেড়ে ছলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা.)! এ-তো হিজরতের প্রস্তুতি মনে হচ্ছে? উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। খোদার কসম! আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাবো, কেননা তোমরা আমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার

করেছ। আমরা ততদিন স্বদেশে ফিরে আসবো না যতক্ষণ খোদা তা'লা আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা ও নিরাপত্তা বিধান না করেন। উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আচ্ছা, খোদা তোমাদের সাথী হোন। তিনি বলেন, আমি তার কণ্ঠে নিদারুণ বেদনা অনুভব করেছি, অথচ তিনি সে সময় মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই হিজরত দেখে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি যে বলেছেন, খোদা তোমাদের সাথী হোন; সেই ধ্বনিতে ছিল এক দয়া ও অনুকম্পা, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো অনুভব করিনি। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) দ্রুত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে চান আর আমি অনুভব করলাম, এ ঘটনায় তাঁর হৃদয় গভীরভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যাহোক, মক্কাবাসীরা যখন তাদের হিজরতের কথা জানতে পারে, তখন তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আর তাদের পিছু পিছু সমুদ্র পর্যন্ত যায়। কিন্তু তাদের সমুদ্র উপকণ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বেই এই কাফেলা ইথিওপিয়ার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। মক্কাবাসীরা এটি অবগত হওয়ার পর ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাদের কাজ হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করা এবং মুসলমানদের মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দিতে তাকে প্ররোচিত করা। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ইথিওপিয়ায় যায় এবং বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে। অমাত্যবর্গকেও তারা চরমভাবে প্ররোচিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করেন। তিনি এদের বিরূপ মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, এবং অমাত্যবর্গের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও (অমাত্যবর্গও মক্কাবাসীদের কথায় প্রলুব্ধ হয় আর তারাও বাদশাহ্‌কে জোর দিয়ে বলে, এদেরকে মক্কাবাসী অর্থাৎ কাফিরদের হাতে তুলে দিন) মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এই প্রতিনিধি দল যখন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে তখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ফেরত আনার জন্য আরেকটি ফন্দি আঁটে আর তা হল, ইথিওপিয়াগামী কতক কাফেলার মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মক্কার সব মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এই খবর ইথিওপিয়ায় পৌঁছা মাত্রই অধিকাংশ মুসলমান সানন্দে মক্কায় ফিরে আসে, কিন্তু মক্কায় পৌঁছে তারা জানতে পারে যে, এ খবর নিছক গুজব ছড়ানো হয়েছে যার কোন সত্যতা নেই। তখন কিছু লোক পুনরায় ইথিওপিয়া ফিরে যায়, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, আর কিছু মক্কায়ই অবস্থান নেয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এই অবস্থানকারীদের মাঝে হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)ও ছিলেন, যিনি মক্কার অনেক বড় এক সম্পদশালী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। এবার তার পিতার এক বন্ধু ওলীদ বিন মুগীরা তাকে আশ্রয় দান করে আর তিনি নিরাপদে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তখন তিনি দেখেন যে, অন্য কতক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হয় আর তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্টের সম্মুখীন করা হয়। তিনি যেহেতু আত্মাভিমানী যুবক ছিলেন, তাই ওলীদের কাছে যান এবং তাকে বলেন, আমি আপনার আশ্রয় ফেরত দিচ্ছি, কেননা আমার জন্য এটি অসহনীয় যে, অন্য মুসলমানরা কষ্ট সহ্য করবে আর আমি আরামে বা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব। সুতরাং ওলীদ ঘোষণা করে যে, উসমান (রা.) এখন আর আমার আশ্রয়ে নেই।

এরপর একদিন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে বসে তার কবিতা শুনাচ্ছিল। সে একটি পঙ্‌ক্তি পড়ে-

وكل نعيم لا محالة زائل

(ওয়া কুল্লু নাঈমিন লা মাহালাতা যায়েলুন)

যার অর্থ হলো- একদিন সকল নেয়ামত ফুরিয়ে যাবে। উসমান বিন মাযঊন (রা.) বলেন, এটি ভুল কথা; জান্নাতের নেয়ামতরাজি চিরস্থায়ী। লাবীদ অনেক বড় এক মানুষ ছিল। এ উত্তর শুনে সে ক্ষেপে যায় এবং বলে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের অতিথিকে তো পূর্বে এভাবে অপদস্থ করা হতো না, এখন এই নতুন সংস্কৃতি কবে থেকে আরম্ভ হলো? তখন এক ব্যক্তি বলে, এ এক নির্বোধ লোক, তার কথায় কর্ণপাত করবেন না। হযরত উসমান (রা.) নিজের কথায় অবিচল থেকে বলেন, নির্বুদ্ধিতার কী আছে, আমি যে কথা বলেছি তা সত্য। তখন এক ব্যক্তি উঠে সজোরে তাঁর মুখে ঘুসি মারে, যার ফলে তাঁর একটি চোখ বের হয়ে আসে বা ফুলে যায়। ওলীদ তখন সেই বৈঠকে বসা ছিল, যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাঁর পিতার বন্ধু ছিল। উসমান (রা.)-এর পিতার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উসমান (রা.)-এর পিতা মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাই নিজের প্রয়াত বন্ধুর পুত্রের এ অবস্থা তার কাছে অসহনীয় ছিল, কিন্তু মক্কার রীতি অনুসারে উসমান (রা.) যেহেতু তার নিরাপত্তায় আশ্রিত ছিলেন না তাই সে তার পক্ষও নিতে পারছিল না। অতএব আর কিছু করতে না পেরে গভীর দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে উসমান (রা.)-কে সম্বোধন করে সে বলে যে, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! খোদার কসম, তোমার এই চোখ এই আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারতো, কেননা তুমি একটি সুদৃঢ় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ছিলে (অর্থাৎ ওলীদের আশ্রয়ে ছিল) কিন্তু তুমি নিজেই তোমার আশ্রয়কে পরিত্যাগ করেছ আর এই দিন দেখছ। উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, আমার সাথে যা কিছু হয়েছে আমি নিজেই তা চাইছিলাম। তুমি আমার বেরিয়ে আসা চোখের জন্য বিলাপ করছ, অথচ আমার সুস্থ চোখও এর জন্য ছটফট করছে যে, আমার বোনের সাথে যা হয়েছে তা আমার সাথে কেন হয় না। তিনি (রা.) লিখেন যে, তিনি বলেন, উসমান (রা.) ওলীদকে উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শই আমার জন্য সব এবং পরিপূর্ণভাবে যথেষ্ট। তিনি যদি কষ্ট সহ্য করেন তাহলে আমি কেন করব না। আমার জন্য খোদার নিরাপত্তাই যথেষ্ট। *(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড: ২০, পৃ: ২০২-২০৫)*

উসমান বিন মাযঊন (রা.) এবং আরবের প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ বিন রাবিআ'র এই ঘটনার উল্লেখ বিভিন্ন ইতিহাসে আরেকভাবেও

পাওয়া যায়, সেটিও শুনিয়ে দিচ্ছি, সে (অর্থাৎ লাবীদ) আরবের প্রসিদ্ধ কবি ছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে কুরাইশদের বৈঠকে বসা ছিল। হযরত উসমান (রা.)ও তার কাছে বসে পড়েন। লাবীদ প্রথমে সেই পঙ্‌ক্তির এই ছত্র পড়ে যে,

الا كل شئ ما خلا الله باطل

(আলা কুল্লু শায়ইন মা খালাল্লাহা বাতেলুন)

অর্থাৎ সাবধান, আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সবকিছু বৃথা। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। এরপর লাবীদ বলে,

وكل نعيم لا محالة زائل

(ওয়া কুল্লু নাঈমিন লা মাহালাতা যায়েলুন)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সকল নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মানুষ তার দিকে তাকায় আর লাবীদকে বলে যে, পুনরায় পড়। তখন লাবীদ পুনরায় পড়ে। হযরত উসমান (রা.) পূর্ববৎ একবার সত্যায়ন ও একবার মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত বিলুপ্ত হবে না। সেই কবি লাবীদ বলে, হে কুরাইশগণ! তোমাদের বৈঠক তো এমন ছিল না। তখন তাদের মধ্য থেকে এক আহাম্মক দাঁড়িয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর চোখের ওপর থাপ্পড় মেরে বসে বা ঘুসি মারে, যার ফলে তাঁর চোখ নীলাভ হয়ে যায়া বা ফুলে যায়। তার চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত মানুষ বলে যে, উসমান! খোদার কসম! তুমি একটি নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে আর তোমার চোখ এমন কষ্ট থেকে নিরাপদ ছিল যা তুমি এখন পেয়েছ। তখন উসমান (রা.) বলেন, খোদার আশ্রয় বেশি নিরাপদ এবং অধিক সম্মানজনক। আর আমার দ্বিতীয় চোখও তদ্রুপ সমস্যাক্লিষ্ট হওয়ার বাসনা রাখে যা দ্বারা এই চোখ ক্লিষ্ট হয়েছে। মহানবী (সা.) এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অনুসরণ আমার জন্য আবশ্যক। ওলীদ বলে, আমার আশ্রয়ে তোমার কী ক্ষতি ছিল? উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বলেন, খোদার নিরাপত্তা ছাড়া অন্য কারো নিরাপত্তার আমার প্রয়োজন নেই। *(উসদুল গাবাহ্, খণ্ড: ০৩, পৃ: ৫৯০, উসমান বিন মাযঊন, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যা, বৈরুত থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)*

এ ছিল তাদের ঈমানী অবস্থা আর এ ছিল নিজের সাথিদের জন্য মর্মবেদনা, অর্থাৎ তারা যদি কষ্টে থাকে তাহলে আমরা কেন (সুরক্ষিত) থাকব? বরং মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালোবাসার যে সম্পর্ক ছিল তা-তো ছিলই, অর্থাৎ তিনি (সা.) যদি কষ্টে থাকেন তাহলে আমি কেন নিরাপদ থাকব, কিন্তু সাহাবীদের অবস্থা দেখেও তাঁর অনেক কষ্ট হতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর এভাবে উত্তর দেয়ার কারণ হলো, পবিত্র কুরআন তার জানা ছিল, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং কুরআন করীম পড়েছিলেন আর এখন তাঁর দৃষ্টিতে কবিতার কোন গুরুত্বই ছিল না। তিনি (রা.) লিখেন যে, পরবর্তীতে লাবীদও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমান হওয়ার পর লাবীদও একই পন্থা অবলম্বন করেছিল। যেমন একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর একজন গভর্ণরকে বলে পাঠান যে, আমার কাছে কিছু প্রসিদ্ধ কবির নতুন কবিতা পাঠাও। লাবীদের কাছে, যিনি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলে তিনি কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তার যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই একটি ঘটনার মাধ্যমে ঘটে, রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ইন্তেকালের পর মহানবী (সা) তাকে চুমু খান আর তখন তাঁর (সা.) চোখ থেকে অশ্রু প্রবহমান ছিল। মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহীমের যখন ইন্তেকাল হয় তখনও তিনি তার পবিত্র লাশের উদ্দেশ্যে বলেন,

الحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعونؓ

[আলহিক্ব বেসালাফিনাস্ সালেহ্ উসমানাবনা মাযঊন (রা.)]। অর্থাৎ আমাদের পুণ্যবান, স্নেহভাজন উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর সাহচর্যে গিয়ে মিলিত হও। *(ফাযায়েলুল কুরআন, খণ্ড: ০৪, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড: ১২, পৃ: ৪৫৬)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মদিনায় হিজরতের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ: উসমান বিন মাযঊন (রা.), হযরত কুদামা বিন মাযঊন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাযঊন (রা.) ও হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) মদিনায় হিজরতের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। অপর এক উক্তি অনুসারে এসব লোক হযরত হেযাম বিন ওদিয়া (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী বর্ণনা করেন, মাযঊন পরিবার তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের নরনারী সকলেই সমবেতভাবে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের কেউ মক্কায় থেকে যায় নি। হযরত উম্মে আলা (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) ও মুহাজিরগণ মদিনা আসেন তখন আনসাররা তাদেরকে নিজেদের ঘরে রাখার ইচ্ছে পোষণ করেন। ফলে তাদের জন্য লটারি করা হয়। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) আমাদের ভাগে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) ও হযরত আবু হায়সাম বিন তায়হান (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। *(তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩, উসমান বিন মাযঊন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯০)*

হযরত উসমান (রা.) মদিনায় হিজরত করেন আর বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সর্বাধিক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে ইবাদত করতেন। দিনে রোজা রাখতেন, রাতে ইবাদত করতেন। জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। নারীসঙ্গ বর্জনের চেষ্টা করতেন।

তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বৈরগ্য অবলম্বন দেয়া ও খোজা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে এমনটি করতে বারণ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ ওসুদুল গাবায় এটি লিখিত আছে। *(ওসুদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯০, উসমান বিন মাযঊন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৩)*

এরপর এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে আসেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরা তাকে আগোছালো অবস্থায় অর্থাৎ ময়লা কাপড় ও এলোচুল দেখে বলেন, তুমি নিজের এ কি অবস্থা বানিয়ে রেখেছ? নিজেকে পরিপাটি করে রেখো। কুরাইশদের কেউ তোমার স্বামীর চেয়ে বেশী সম্পদশালী নয়। এমন নয় যে, তোমার সামর্থ্য নেই। তোমার স্বামী খুবই বিত্তবান মানুষ, নিজের অবস্থা সুধরাও। তখন হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী পাশে বসে থাকা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা উসমানের যে ধনসম্পদের কথা বলছেন সেসবে আমাদের কোন অধিকার নেই; কেন? কেননা আমার জন্য তার হৃদয়ে কোন আবেগ-অনুভূতি নেই। তিনি রাতে ইবাদত করেন আর দিনে রোজা রাখেন আর আল্লাহর ইবাদতেই রত থাকেন, আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন না। মহানবী (সা.) বাড়ি ফিরলে তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা তাঁকে উসমান (রা.)-এর স্ত্রীর কথা অবহিত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার সত্তায় কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই? তিনি নিবেদন করেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, ব্যাপার কী? আমি শতভাগ আপনার কথা অনুসারে চলার চেষ্টা করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সারাদিন রোজা রাখ আর সারারাত ইবাদত কর? তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি এমনই করি। তিনি (সা.) বলেন, এমনটি করো না। তোমার চোখের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার দেহের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার-পরিজনেরও তোমার কাছে প্রাপ্য রয়েছে, তোমার স্ত্রী-সন্তানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নামায পড়, আবার ঘুমাও। নফল পড়, রাতে জাগ, কিন্তু ঘুমানোও আবশ্যক। রোজা রাখ আবার রোজা ছেড়েও দাও। যদি ঐচ্ছিক রোজা রাখতে হয় রাখ, কিন্তু কিছু দিন রোজা ছেড়ে দেয়াও আবশ্যক। হযরত উসমান (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর একথা বলার স্বল্পকাল পর তাঁর স্ত্রী পুনরায় মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের কাছে আসেন। তিনি তখন এমনভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন তিনি নববধূ। তাঁরা বলেন ব্যপার কী, আজ খুব সেজেগুজে রয়েছে? তখন তিনি বলেন, লোকেরা যা পায়, আমরাও এখন তা পাচ্ছি অর্থাৎ এখন স্বামী আমাদের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। *(তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০২, উসমান বিন মাযঊন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯০)*

এ বিষয়ে হযরত আয়েশার (রা.)-এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, তুমি কি আমার রীতি অপছন্দ কর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না, আমি আপনার পন্থাই অন্বেষণ করি। তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমাইও, আবার নামাযও পড়ি। রোজাও রাখি আবার রোজা ছেড়েও দেই। মহিলাদের বিয়েও করি। হে উসমান! খোদাকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে, আর স্বয়ং তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন কোন সময় রোজা রেখো আর কোন সময় ছেড়ে দিও। নামাযও পড় আবার নিদ্রাযাপনও কর।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে স্ত্রীদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু তিনি (সা.)-এর অনুমতি দেন নি। যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে আমরাও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খোজা বানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। *[সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) পৃষ্ঠা: ৪১৮]* অর্থাৎ এই আকর্ষণকে বিলুপ্ত করার জন্য পুরো চেষ্টা করতাম।

বুখারীর যে হাদীসটি রয়েছে সেটির অনুবাদ তুলে ধরছি। হযরত সাদ বিন ওক্কাস (রা.) বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগের যে অনুমতি মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রার্থনা করেছেন, মহানবী সেই অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এটি বুখারীর নিকাহ্ অধ্যায়ের হাদীস। তাতে এটিও লেখা আছে যে, তিনি (সা.) যদি অনুমতি দিতেন তাহলে হয়ত আমরা সকলেই সম্পূর্ণভাবে বৈরাগী বা সংসারত্যাগী হয়ে যেতাম। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস: ৫০৭৩)*

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরো লিখেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন বনী জুমাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখতেন। অত্যন্ত সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি অজ্ঞতার যুগেই মদ্যপান করা থেকে দূরে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনো মদ পান করতেন না। ইসলাম গ্রহণের পরও সংসারত্যাগী হওয়ার বাসনা রাখতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এই বলে তাকে অনুমতি দেন নি যে, ইসলামে খোজা হওয়ার অনুমতি নেই। *[সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) পৃষ্ঠা: ১২৪]*

ইসলাম বলে পৃথিবীতে বসবাস করে আল্লাহ তা'লা পৃথিবীতে যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন সেগুলো উপভোগ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলবে না। তিনি যেন সবসময় তোমাদের দৃষ্টিপটে থাকেন।

হযরত কুদামা বিন মাযঊন (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি তার বাহনের ওপর ছিলেন আর উসমান তাঁর বাহনের ওপর। 'আসায়া' নামক উপত্যকায় তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। 'আসায়া' যুল হুলায়ফার পর 'জোহফা'র রাস্তায় মদিনা থেকে ৭৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি এই জায়গার ভৌগলিক অবস্থান। হযরত উসমান (রা.)-এর উষ্ট্রী

অধিক নিকটে চলে আসার কারণে হযরত উমর (রা.)-এর উষ্ট্রী হযরত উসমান (রা.)-এর উটকে ধাক্কা দেয়। মহানবী (সা.)-এর বাহন কাফেলার বেশ অগ্রভাগে ছিল। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) বলেন, ইয়া গালকাল ফিতনা! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বাহন যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) কাছে আসেন আর বলেন, হে আবু সায়েব! (অর্থাৎ হযরত উসমান বিন মাযঊনকে বলেন) খোদা তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি আমাকে এটি কোন নামে ডাকলে? তিনি গালকুল ফিতনা বলে ডেকেছিলেন। তিনি বলেন, খোদার কসম, যেনামে আমি আপনাকে ডেকেছি সেই নাম আমি রাখিনি বরং মহানবী (সা.) আপনার সেই নাম রেখেছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, মহানবী (সা.) কাফেলার অগ্রভাগে রয়েছেন, আপনি যদি চান তাঁকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন। এর বিস্তারিত বিবরণ তিনি এভাবে প্রদান করেন যে, একবার তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যান আর আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, এব্যক্তি গালকুল ফিতনা অর্থাৎ নৈরাজ্যের পথে বাধা। একথা বলতে গিয়ে তিনি (সা.) তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন যে, তোমাদের ও নৈরাজ্যের মাঝে একটি দ্বার থাকবে আর তা যা কঠিনভাবে বন্ধ থাকবে ততদিন যতদিন এ ব্যক্তি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকবেন। *(মু'জামুল কাবির, আত তিবরানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯, হাদীস নং ৮৩২১, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (ফারহাঙ্গে সীরাত, সৈয়দ ফজলুর রহমান, পৃ. ২৯, ২০০৩ সনে করাচিতে মুদ্রিত)*

অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ইসলামে কোন নৈরাজ্য দেখা দেবে না আর ইতিহাসও তা-ই বলে। এর পরই বেশির ভাগ নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছে।

এখানে হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) যে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে 'গালকুল ফিতনা' শব্দ ব্যবহার করেছেন এর বিশদ বিবরণ দিচ্ছি। হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে কে নৈরাজ্য সম্পর্কে মাহনবী (সা.)-এর কথা মনে রেখেছে? আমি বললাম, আমি ঠিক সেভাবে স্মরণ রেখেছি যেভাবে তিনি (সা.) বলেছেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আমার স্মরণ রয়েছে। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে বা বলেছেন রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক সাহস রাখ। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস অনেক বেশি মনে হচ্ছে আর এ ক্ষেত্রে তুমি অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করছ। আমি বললাম, মানুষের ওপর তার স্ত্রী, সম্পদ ও সন্তানসন্ততি এবং প্রতিবেশীর কারণে পরীক্ষা আসে; এগুলোও নৈরাজ্য। আর নামায, রোযা, সদকা, পুণ্যের আদেশ দেয়া আর পাপ থেকে বিরত রাখা এই পরীক্ষাকে দূর করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কথার অর্থ সন্তানসন্ততি, সম্পদ ইত্যাদির ফিতনা নয়, যা তুমি নামায পড়ে, রোযা রেখে, নেক কাজ করে, সদকা দিয়ে দূরীভূত করতে পার, বরং আমি সেই নৈরাজ্যের কথা বলছি যা সেভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হবে যেভাবে সমুদ্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় ভয়াবহ ফিতনা যা এই উম্মতে দেখা দিবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেটির জন্য আপনার কোন ভয় নেই। অর্থাৎ সেই নৈরাজ্য যা দেখা দেবে, এর পক্ষ থেকে আপনার কোন আশঙ্কা নেই। আপনার আয়ুষ্কালে এটি দেখা দেয়ার কোন আশঙ্কা নেই, কেননা আপনার ও এর মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কি ভাঙা হবে, নাকি খোলা হবে? তিনি (অর্থাৎ হুযায়ফা) সে কথাই বলেন, যা মহানবী (সা.) বলেছেন, এক আবদ্ধ দরজা থাকবে। অর্থাৎ নৈরাজ্য ও তার মাঝে একটি আবদ্ধ দ্বার বিদ্যমান থাকবে। হযরত উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই দরজা কি ভেঙে ফেলা হবে, নাকি খুলে দেয়া হবে? তিনি বলেন, সেই দরজা ভেঙে ফেলা হবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে তা কখনো বন্ধ হবে না। দরজা যদি খোলা হয় তাহলে বন্ধ করার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে তা বন্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে তো তা কখনো বন্ধ হবে না। অর্থাৎ নৈরাজ্য একবার আরম্ভ হলে তা চলমান থাকবে। আজ আমরা দেখি যে, এ সকল নৈরাজ্য উম্মতে মুসলেমায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একের পর এক নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছে। হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর যুগে এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও, বরং এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। মনে হয় যেন তারা একে অন্যের রক্তপিপাসু শত্রু। আর সেই দেয়ালের পেছনে এরা আশ্রয় নিতে চায় না যা আল্লাহ তা'লা এযুগে সেই দ্বার বন্ধ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নৈরাজ্য বেড়েই চলেছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন, আমরা আহমদীরা যেন সেই ঢালের পেছনে থাকি যা আল্লাহ তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ এর মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন; এবং সেই দেয়ালের পেছনে থাকি। যাহোক, হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মাঝে এসব কথা হচ্ছিল। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে তো এই নৈরাজ্য কখনো বন্ধ হবে না। তখন আমরা, অর্থাৎ যারা বসেছিলাম তারা রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করি, হযরত উমর (রা.) সেই দরজাকে জানতেন কি? হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, জানতেন। তিনি ঠিক সেভাবে জানতেন যেভাবে পরবর্তী দিন আসার পূর্বে রাত হয়ে তাকে। অর্থাৎ এটি শতভাগ নিশ্চিত কথা। হযরত উমর জানতেন যে, তার (রা.) পরে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেবে। *(সহীহ বুখারী, কিতাব মাওয়াকেত, হাদীস ৫২৫)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) প্রথম মুহাজের ছিলেন যিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের ২২মাস পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর যাদেরকে জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়েছে তাদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। *(উসদুলগাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১, উসমান বিন মাযউন, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

যাহোক, তার বরাতে আরো কিছু কথা রয়ে গেছে, যা ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করবো।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

আবারো গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পায়তারা

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রতিটি ধর্মই মানুষের মধ্যে সাম্য, একতা, মানবতা এবং সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে সহাবস্থানে বসবাসের শিক্ষা দেয়। এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে সম্মান করার আদেশ বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। ধর্মপালন কিংবা বর্জন ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার।

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এটা প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সূরা কাহাফ: ২৯)। সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক। যেমন সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতণ্ডার অবকাশ নেই। সূর্যোদয় সত্বেও কেউ যদি সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে বোকা বলা যেতে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কিছুই নেই। ঠিক তেমনি কে আল্লাহকে মানলো বা মানলো না, কে ধর্ম পালন করলো বা করলো না এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ নিজে করবেন বলে তার শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কুরআনে বার বার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে হিন্দুও থাকবে এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরাও থাকবে।

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে আহমদীয়া মসজিদে উগ্রধর্মান্ধগোষ্ঠি হামলার পর তারাই এখন মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেশে অশান্তকর পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। ধর্মান্ধদের দাবি আহমদীরা নাকি তাদের মাদ্রাসায় আক্রমণ চালিয়েছে! কত বড় মিথ্যা! লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন- মিথ্যাচারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। স্থানীয় সূত্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমদীরা নিজেদের মসজিদের ভিতরে ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান করছিল।

আহমদীরা সেখানে শতবর্ষের বেশী সময় ধরে বসবাস করছে, ১৯৬৩ সালে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই আহমদীয়া বার্ষিক সম্মেলনে মৌলবীরা আক্রমণ করে দু'জন আহমদী- ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম সাহেবকে শহীদ করে। আবার পাল্টা আহমদীদের উপর মিথ্যা মামলা করা হয় যে, আহমদীরা নাকি মৌলবীদের উপর আক্রমণ করেছে! ১৯৮৭ সালে আহমদীদের নিজেদের জায়গায় স্থাপিত নিজেদের মসজিদ জবরদখল করে নেয় এই মোল্লাচক্র! আজও সেটি ওদের বেআইনি দখলে। আহমদীরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করা সত্বেও সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু, আহমদীরা কোন দিন আইন নিজের হাতে তুলে নেয় নি। আজ যে মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে, এটি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছু নয়। এরা তাদের ওস্তাদ পাকিস্তানী মোল্লাদের অনুকরণে মিথ্যা ও গুজব ছড়িয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়।

পবিত্র কোরআন এবং মহানবী (সা.) সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্ম কর্ম পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন- জেনে রাখ, যে ব্যক্তি কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলমানের ওপর যুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার ওপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার অনুমতি ব্যতীত তার কোন বস্তু নিয়ে নিবে আমি পরকালে বিচার দিবসে তার বিপক্ষে অবস্থান করবো। *(আবু দাউদ)*

ইসলাম কারো ইবাদতগাহ এমনকি অমুসলমানদের উপাসনালয়েও হামলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। শুধু তা-ই নয় অমুসলমানরা যেগুলোর উপাসনা করে সেগুলিকেও গালমন্দ করতেও বারন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তারা আল্লাহকে ছেড়ে উপাস্য রূপে ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশত: আল্লাহকে গালি দিবে। *(সূরা আনআম: ১১০)*

ফলে ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এক সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টির ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। কাজেই ধর্মীয় উন্মাদনায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা বা অন্য কোন স্থাপনা ভাঙ্গা ও জ্বালিয়ে দেয়া এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করা কোন ধর্মীয় কাজ নয়। বল প্রয়োগে কোন ধর্ম মত চাপিয়ে দেয়া কোন ধর্মই স্বীকৃতি দেয় না। অনেক ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদী জেহাদের ঘোষনা করে

হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু ইসলামে জেহাদের বড় তাৎপর্য হল নিজের আত্মশুদ্ধিকল্পে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। নিজের মাঝে মনুষ্যত্বের গুণাবলীর উৎকর্ষতা বিকশিত করা। আদর্শ ও ভালোবাসা সৃষ্টি এবং যুক্তির মাধ্যমে অপরকে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইসলামী বিধান পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- তুমি মন্দকে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে দেখবে যার সাথে আজ তোমার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। *(সূরা হামীম আস সাজদা : ৩৬)*

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উক্ত ঘটনার পরপরই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে আহমদ তবশীর চৌধুরী স্বাক্ষরিক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মূল বিষয়টি দেশবাসীকে অবগত করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়- "১৪ জানুয়ারি ২০২০ মাগরিবের নামাযের পর একদল উগ্র-ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কান্দিপাড়ায় অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ "মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ"-এ হামলা চালায়। 'কাদিয়ানিরা মাদ্রাসার ছাত্রদের পিটিয়েছে' এমন মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে আক্রমণকারীরা লোকজনকে উত্তেজিত করে এবং আক্রমণ চালায়। তাদের ইটপাটকেলের আঘাতে তিনতলা মসজিদের কাঁচের জানালাগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং লোহার গেট ভেঙ্গে মসজিদ প্রাঙ্গনে ঢোকার চেষ্টা করে। তারা পার্শবর্তী বাড়িতে রাখা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো-চ-১৬-১৮৭৭) ভাঙচুর করে। আক্রমণকারীরা আশেপাশে আহমদীদের বাড়িঘরেও হামলা চালায়।

আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে এবং ওরা আবারো মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণের পরিকল্পনা করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এরা বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় এখনো গুজব ছড়াচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উগ্র-ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি ইতিপূর্বে গুজব ছড়িয়ে খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে, রামুর বৌদ্ধ মন্দিরে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরপুরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর এবং কিছুদিন আগে ভোলার বোরহানুদ্দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালে এভাবে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পুরনো আহমদীয়া মসজিদটি সাম্প্রদায়িক শক্তি বলপূর্বক দখল করে নেয় এবং এখন পর্যন্ত তারা সেটি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। আজকের এই আক্রমণ সেখান থেকেই পরিচালনা করা হয়েছে।

আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ শান্তিপ্রিয় এবং দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক। আমরা কখনোই আইন নিজের হাতে তুলে নেই না।

আমরা এধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং গুজব-সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তদের আইনের আওতায় এনে আমাদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

যারা ধর্মের নামে এসব গর্হিত কাজে লিপ্ত তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। এর পূর্বে আমরা দেখেছি ধর্ম অবমাননার কথা বলে বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা। ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কখনও ইসলাম সমর্থন করে না। আজ যারা বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে এবং বড় ধরণের নাশকতার চিন্তাভাবনা করছে তাদের বলতে চাই, মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা কি জ্বালাও পোড়াও করে অর্জিত হবে, নাকি মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ স্থাপন করার মাধ্যমে অর্জিত হবে? যেখানে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, 'তিনিই তার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি সব ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক' (সূরা তাওবা: ৩৩)। কে ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করলো বা অপছন্দ করল তা দেখার জন্য কাউকে আল্লাহ মনোনিত করেন নি। ইসলাম সত্য ধর্ম আর এই ধর্মকে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লারই। এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মের আদেশ এবং নীতির মাহত্ম বা পরমোৎকর্ষ ইতোমধ্যেই ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করে চলছে এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসের ওপর বিজয় লাভ করবে এবং সেইসব ধর্মের অনুসারীরা দলে দলে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে সমবেত হবে। অবশ্যই সবাই এই শান্তির ধর্মে আশ্রয় নিবে তবে তা জঙ্গি কার্যক্রমের মাধ্যমে নয়, তা হবে কুরআনের উন্নত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এবং ঐশী একক নেতৃত্বের সুবাদে। ইসলাম পরিপূর্ণ একটি ধর্ম। এই ধর্মের কোন ক্ষতি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম'। *(সূরা মায়েদা: ৪)*

একটি মিথ্যা অপপ্রচার বা গুজব কত সহজেই যে জনগণের কোন কোন অংশকে উত্তেজিত করে ভয়ংকর কাণ্ড তথা লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে পারে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই রয়েছে। যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার রামুতে হামলা চালিয়ে লুটপাটসহ ১২টি বৌদ্ধমন্দির ও ৩০টি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে রসরাজ নামে এক মৎস্যজীবীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনে লোকজনকে খেপিয়ে তুলে ঘরবাড়ি ও মন্দিরে হামলা চালানো হয়। গত ২০ অক্টোবর ভোলার বোরহানউদ্দিনে ঘটে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক যুবকের বিচারের দাবিতে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে বিক্ষোভ থেকে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে।

আমাদের আবেদন, সরকার-প্রশাসন দৃঢ়ভাবে এদের সব ধরণের অপচেষ্টার মূল উৎপাটন করবেন, দেশের সচেতন ও বিবেকবান জনগণ এদের মিথ্যা ফাঁদে পা দিবেন না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মত একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর দুরভিসন্ধি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৯)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে মত–পার্থক্যঃ কি এবং কেন ?

হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে গমন এবং আখেরী যুগে সশরীরে পুনরাগমন সংক্রান্ত আরো কতিপয় বিভ্রান্তি-মূলক অপ-প্রচারের দৃষ্টান্ত এবং সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ

(১) সূরা নিসা- (৪ : ১৫৮-১৬০) এবং সূরা আলে ইমরান: ৫৫-৫৬ আয়াতে বর্ণিত নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে কোন কোন আলেম বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করে থাকেন। সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

❖ "তারা (ইহুদীরা) তাকে (ঈসা'কে) কতল (হত্যা) করতে পারে নাই (ওয়ামাকাতালুহু) এবং 'তাকে ক্রশ-বিদ্ধ করেও মারতে পারে নাই' (ওমা সালাবুহু) (৪ : ১৫৮)।"

❖ "কিন্তু তাদের (ইহুদীদের) কাছে তাকে (ঈসা'কে) অনুরূপই করা হয়েছিল (ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম) (৪ : ১৫৮)

❖ "বরং আল্লাহ তাকে (ঈসা'কে) নিজের দিকে উন্নীত করেছেন; (বার রাফাহুল্লাহ্ ইলাইহে)" (৪ : ১৫৯) এবং তাকে মৃত্যুর পরে আল্লাহর দিকে উন্নীত (রাফা) করেছেন (৩ : ৫৫-৫৬)

❖ "আর আহলে কিতাবের মাঝে এমন (কোন গোত্র বা দল) নেই যারা তার (ঈসা'র) মৃত্যুর আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না" (লা-ইউমিনান্নাবিহি কাবলা মাওতিহি) (৪ : ১৬০)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজিদ বাংলা অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার আলোকে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইহুদীদের হাতে ঈসা (আ.) মারা যান নাই–

ইহুদীদের হাতে যে ঈসা (আ.) মারা যাননি-আলোচ্য আয়াতের মূল কথা এটাই। আয়াতের শুরুতেই পাঠককে ইহুদীদের দাম্ভিকতাপূর্ণ এ দাবীর কথা স্মরণ করানো হয়েছে যে তারা নাকি ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল, যাই ঘটে থাকুক তারা তাঁকে হত্যা করতে নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, ক্রুশবিদ্ধ করা ঘটনাকে এক্ষেত্রে অস্বীকার করা হচ্ছে না-বরং ক্রুশে বিদ্ধ করে ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে।

ক্রুশের দ্বারা ঈসা (আ.) মারা যান নাই তাঁকে মৃতব্য মনে হয়েছিলঃ

এই আয়াতে 'ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম' এর মাঝে 'শুব্বিহা' শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর পূর্বে ব্যবহৃত বাক্যটি আলোচ্য 'শুব্বিহা' শব্দটি ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ করার সুযোগ দেয় না। বড়জোর, 'শুব্বিহা' শব্দটি সাধারণভাবে পুরো ঘটনার প্রতি ঈঙ্গিত করে থাকতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'শুব্বিহা' (অর্থ: তাকে সদৃশ বা অনুরূপ করা হলো) শব্দটিতে যে 'উপ-সর্বনাম' রয়েছে তা একমাত্র ঈসা (আ.) ছাড়া আর কারো প্রতি আরোপিত হতেই পারে না। এর অর্থ হলো, ঈসা (আ.)-ই ছিলেন যাঁকে তাদের চোখে অনুরূপ বা সদৃশ করা হয়েছিল। অতএব ঈসা (আ.)-কে যখন ক্রুশে চড়ানো হলো তখন এক পর্যায়ে তাকে মৃতবৎ মনে হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে এখানে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া বা এতে মৃতবৎ হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। যা অস্বীকার করা হচ্ছে তা হলো, তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ। প্রকৃতই সেখানে কি ঘটেছিল সেই বিষয়ে তখন এক বড় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। অতএব, আয়াতটিও তদানুযায়ী নিজের মাঝে একই ভাব নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। আয়াতটিতে বর্ণিত বিষয়ের বাইরে যা-ই বলা হয় তা অনুমানভিত্তিক কথা মাত্র। এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

'শুব্বিহা' শব্দটি পুরো ঘটনার প্রতি আরোপিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও কী ঘটেছিল সেই বিষয়ে বিবদমান দু'টি দলের পরস্পর বিরোধী দাবী এতে খন্ডন করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

বিবাদমান দু'দলের কেউ দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ও তাঁর পুনরুত্থান হয়েছে- খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসের পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তা ছিল কেবল অনুমানভিত্তিক একটি কথা। একইভাবে ইহুদীদের পক্ষ থেকে

ক্রুশবিদ্ধ করে ঈসা (আ.)-এর দেহটি তাদের কাছে হস্তান্তর করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কেননা, তারা কথিত মৃত্যুর ঘটনাটিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তারা আশঙ্কা করছিল, ঈসা (আ.) বেঁচে থাকলে তিনি জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে দাবী করবেন, যে তিনি মৃতদের মাঝ থেকে পুনরুজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছেন। (মথি: ৬৩-৬৪)।

'মা কাতালুহু ইয়াকীনান' বাক্যের অর্থ-

(১) ইহুদীরা তাকে নিশ্চিয় হত্যা করতে পারেনি; (২). তারা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর অনুমানকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ-মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা সন্দেহাতীতভাবে তাদের মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেনি। এ ক্ষেত্রে 'কাতালাহু' এর 'হু' ব্যবহৃত হয়েছে 'যান্ন' (অনুমান) শব্দের সর্বনামরূপে। আরব'রা বলে, 'কাতালাশ শাইয়া খুবরান' অর্থাৎ সে বিষয়টি সম্পর্কে এতো জ্ঞান লাভ করেছিল যে সেই বিষয়ে তার সন্দেহের লেশ মাত্র রইলোনা (লেইন, লিসান এবং মুফররাদাত)। ঈসা (আ.) যে ক্রুশে মৃত্যু বরণ না করে পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তা কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। (এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি)। বাইবেলের নিম্নবর্ণিত কথাগুলো থেকেও কুরআনের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

(ক) ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাছাড়া পুণ্যজীবনের অবসান ক্রুশের ওপরে কখনই হতে পারে না। কারণ বাইবেল অনুযায়ী যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে আল্লাহ্‌র অভিশাপগ্রস্ত (দ্বিতীয়- ২১:২৩)';

(খ) তিনি অতিশয় কাতর হৃদয়ে রাতভর দোয়া করেছিলেন, 'আমার নিকট হতে এ পান পাত্র দূর কর' (মার্ক- ১৪:৩৬; মথি- ২৬:৩৯; লুক- ২২:৪২) এবং তাঁর এ দোয়া গৃহীত হয়েছিল (হব- ৫ : ৭);

(গ) তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউনুস নবী (আ.) যেমন মাছের পেটে জীবিতাবস্থায় ছিলেন এবং জীবিত অবস্থায়ই পেট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন (মথি- ১২:৪২), তেমনি তিন দিন খোদিত কবর থেকে জীবিত অবস্থায়ই বের হয়ে আসবেন;

(ঘ) তিনি এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইস্‌রাঈলের দশটি হারানো গোত্রকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হবে (যোহন- ১০:১৬)।

(ঙ) ঈসা (আ.) মাত্র তিন ঘন্টার মত ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন (যোহন- ১৯:১৪) এবং তাঁর মত স্বাভাবিক শারীরিক গঠনের ব্যক্তি এত অল্প সময়ে ক্রুশে মরতে পারেন না;

(চ) ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় তার পার্শ্বদেশে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় এবং রক্ত ও পানি সেই আহত-স্থল থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বের হয়ে আসে। এটা তাঁর জীবিত থাকার পরিচায়ক (যোহন- ১৯:৩৪);

(ছ) ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে ইহুদীরা নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা পীলাতকে তাঁর কবরে পাহারাদার রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা এ বলে অনুরোধ করেছিল, 'তাঁর শিষ্যরা রাত্রে আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং তৎপর জনগণের কাছে বলিতে পারে, 'তিনি মৃতের মধ্য হইতে, জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন' (মথি- ২৭:৬৪);

(জ) সুসমাচারগুলোর একটিতেও এমন কোন চাক্ষুস-সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ নেই যে, তাকে ক্রুশ থেকে নামাবার সময়ে তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন, কিংবা কবরে রাখার সময়ে তিনি মৃত ছিলেন। তাছাড়া তাঁকে ক্রুশে চড়াবার সময় একজন অনুসারীও সেই দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন না। তারা সকলেই আত্মগোপন করেছিলেন। আসল ঘটনা ছিল পীলাতের স্ত্রীর পূর্ববর্তী রাত্রের স্বপ্ন-বাণী, 'সেই ন্যায়বান ব্যক্তির ক্ষতি কর না', পীলাতের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে ঈসা (আ.) নিরপরাধ। তাই পীলাত, 'এসেনি' ফেরকার সম্মানিত ব্যক্তি আরিমেথিয়ার যোসেফের সাথে যুক্তি-পরামর্শ করে ঈসা (আ.)-কে বাঁচার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কারণ নবুওত লাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈসা (আ.) 'এসেনি' ফেরকারই সদস্য ছিলেন। ঈসা (আ.)-এর বিচার হয়েছিল শুক্রবার। পীলাত বিচার-কার্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘায়িত করেছিলেন। তিনি জানতেন, ক্রুশের শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যায়ই ক্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তাই তিনি যখন ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ক্রুশের শাস্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন তখন সূর্যাস্ত হতে মাত্র তিন ঘন্টা বাকী ছিল। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সাধারণত স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এমন অল্প সময়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে না। পীলাত কিছু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। ঈসা (আ.)-কে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামানো হলো (সম্ভবত সিরকার প্রভাবে অচেতন ছিলেন) তখন আরিমেথিয়ার যোসেফের অনুরোধে পীলাত সাথে সাথে ঈসা (আ.)-এর দেহ তাকে সমর্পণ করলেন। ঈসা (আ.)-এর সাথে দু'জন অপরাধীকেও ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর হাড় ভাঙ্গা হয়নি। যোসেফ পাহাড়ের টিলার গোত্রে খোদিত প্রশস্ত কোঠায়, তাঁর দেহটি রেখেছিলেন। তাঁর দেহের কোনরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি, জীবিত কি মৃত তাও পরীক্ষা করা হয়নি, এমন কি এ ব্যাপারে তাঁর অন্তিম সময়ের কারো সাক্ষ্য প্রমাণও নেয়া হয়নি (মিস্‌টিকেল লাইফ অব জিসাস, প্রণেতা এইচ, স্পেন্সার লিউসই);

(ঝ) একটি ভেষজ মলম (এটি পরে 'মরহমে ঈসা' বা ঈসা'র মলম নামে পরিচিত হয়) তৈরী করে তাঁর ক্ষতস্থানগুলোতে প্রলেপ দেয়া হয় এবং আরিমেথিয়ার যোসেফ ও নিকোডিমাস তাঁর শুশ্রূষা ও সেবা-যত্ন করতে থাকেন। নিকোডিমাস এসেনি ভ্রাতৃমন্ডলী'র একজন অতি সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন;

(ঞ) ঈসা (আ.)-এর ক্ষতগুলো মোটামুটি সেরে উঠলে তিনি কবরটি ত্যাগ করেন

এবং রাতের বেলায় পর পর কয়েকজন শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পদব্রজে জেরুযালেম থেকে গেলিলী চলে যান (লুক- ২৪:৫০);

(ট) আমেরিকায় প্রথমে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'দি ক্রুসিফিক্শেন বাই এন আই-উইটনেস' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্রুশের ঘটনার সাত বৎসর পর জেরুযালেমের 'এসেনি' ভ্রাতৃ-মন্ডলীর একজন সদস্য আলেক্জান্দ্রিয়ার অপর এসেনি ভ্রাতা সদস্যকে এ বিষয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটির পুরাতন ল্যাটিন ভাষার কপির ইংরেজী অনুবাদ করে উক্ত পুস্তকটিতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি এ অভিমতের জোরালো সমর্থন যোগাচ্ছে যে ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে অবতরণের পর জীবিত ছিলেন। পুস্তকখানা ক্রুশে-লটকানোর পূর্ব-ঘটনাবলীর বিবরণ, ক্রুশে-ঝুলানোর দৃশ্যাবলী এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে (তফ্সীরের 'বৃহত্তর ইংরেজি বা উর্দু সংস্করণ দেখুন)।

ঈসা (আ.)-এর তথাকথিত ক্রুশবিদ্ধ-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহুদীদের মাঝে দু'টি পৃথক মতামত রয়েছে। একদল বলে, তাঁকে প্রথমে মারা হয়েছিল এবং পরে তাঁর মৃতদেহ ক্রুশে লটকানো হয়েছিল। অন্যেরা বলে, ক্রুশে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত মতটি প্রেরিত-৫:৩০-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে লেখা আছে, "যাহা তোমরা বধ করিয়াছিলে এবং গাছে ঝুলাইয়া দিলে।" কুরআন এ দু'টি অভিমতকেই খণ্ডন করে বলছে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে নি, এমন কি ক্রুশে দিয়েও হত্যা করতে পারে নি। প্রথমে কুরআন বলছে, তারা বহু রকমের চেষ্টা করে কোন প্রকারেই তাঁকে হত্যা করতে পারে নি, অতঃপর বলছে শেষ পর্যন্ত তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল, কিন্তু তাতেও তাঁকে মারতে পারলো না। কুরআন ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে দেয়ার কথা অস্বীকার করে নি, বরং ক্রুশের ওপরেই ঈসা (আ.) মারা গেছেন, এ কথাটি অস্বীকার করে।

আল্লাহ তাকে (ঈসা কে) নিজের দিকে 'রাফা' অর্থাৎ উন্নীত করার কথা বলেছেনড় এই কথার মধ্যে দৈহিকভাবে আকাশে উন্নীত করার কথা বলেন নাইঃ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত "বার রাফাআহুল্লাহ ইলায়হি ..... অধিকাংশ গোঁড়া আলেম এই আয়াত থেকে অনুমান করেন, 'বাল' (বরং) শব্দটি ক্রুশে বিদ্ধ করার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যু দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ স্বশরীরে আকাশে তুলে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব তাকে ক্রুশেবিদ্ধ করার প্রচেষ্টার পূর্বে তিনি যে দেহের অধিকারী ছিলেন সেই রক্তমাংসের দেহ নিয়েই তিনি বর্তমানে মহা আকাশের কোথাও জীবিত আছেন–গোঁড়া আলেমদের এই ব্যাখ্যাটি অনেক জটিল প্রশ্নের জন্ম দেয়ঃ

(ক) ঈসা (আ.) যদি আদৌ ক্রুশেবিদ্ধ না হয়ে থাকেন তবে সেটা ক্রুশীয় ঘটনাটির ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মমত ও রোমানদের মাঝে প্রচলিত সব বিশ্বাস কি নিছক এক কল্পকাহিনী?

(খ) এ আয়াতের কোন্ স্থলে কোথায় ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আকাশে তুলে নেওয়ার দাবী করা হয়েছে? অথচ এই আয়াতের মোদ্দা কথা হলো আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন।

প্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গোঁড়া আলেমরা এমন এক আজগুবি দৃশ্যপট রচনা করেছেন যাতে ক্রুশীয় ঘটনাকে অস্বীকার করা হয়নি ঠিকিই- কিন্তু দাবী করা হয়েছে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশেবিদ্ধ করা হয়েছিল তিনি ঈসা ভিন্ন অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তিকেই আল্লাহ্‌র আদেশে ফিরিশ্‌তারা নাকি ঈসা-সদৃশ করে দিয়েছিল। অতএব, যে ব্যক্তিকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল সব সন্দেহ ও অনুমান ছিল সেই ব্যক্তিকে ঘিরে। বলা বাহুল্য, প্রশ্নের অপনোদন না করে বরং এই কাল্পনিক ব্যাখ্যা আরো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের অলীক দাবীর ভিত্তি কোন ধর্ম গ্রন্থে বা মহানবী (সা.)-এর কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গল্প দ্বিধাদন্দ্ব ও সন্দেহের কেবল বৃদ্ধিসাধনই করে থাকে। আলোচ্য আয়াতটির এ ধরনের অভিনব ব্যাখ্যা যেন মধ্যযুগীয় ধর্মবিশারদদের কাছেই ধরা পড়েছিল, অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এ সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন (মাআযাল্লাহ্)।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, এ দাবীর দুর্বলতা স্বয়ং কুরআন শরীফের কথা থেকেই প্রতীয়মান হয়। 'রাফা' শব্দের অর্থ হলো 'উন্নীত হওয়া'। মহান আল্লাহ্ যখন কোন ব্যক্তিকে উন্নীত করেন তখন এর অর্থ সব সময় আত্মিক মর্যাদার উন্নতি হয়ে থাকে-দৈহিক উন্নতি কখনো বুঝানো হয় না। প্রকৃতপক্ষে আত্মিক উন্নতি ছাড়া এ আয়াতের কোন অর্থ করা সম্ভবই নয়।

প্রথমে মৃত্যু এবং পরে 'রাফা' হয়েছেড় বর্ণনার এই ক্রমধারা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ সুরা আলে ইমরানঃ ৫৫-৫৬ আয়াতের ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো–

ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করলো, ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে দিয়ে তাঁর 'অভিশপ্ত-মৃত্যু' ঘটাবে (দ্বি, বি, ২১:২৪)। কিন্তু আল্লাহ্ পরিকল্পনা নিলেন ঈসা (আ.)-কে ক্রুশীয়-মৃত্যু থেকে বাঁচাবেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো এবং আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কার্যকরী হলো। কেননা ঈসা (আ.) ক্রুশে মারা যান নি, মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হলেও জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং ঘটনস্থালে থেকে বহুদূরে অনেক-অনেক বছর পরে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় তিনি কাশ্মীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

'তাওয়াফ্‌ফা' শব্দ থেকে 'মুতাওয়াফ্‌ফি' উৎপন্ন হয়েছে

আরবীতে বলা হয় 'তাওয়াফ্‌ফাল্লাহু যায়দান্ অর্থাৎ আল্লাহ্ যায়্‌দের আত্মাকে উঠিয়ে নিলেন, যার অর্থ, আল্লাহ যায়্‌দকে মৃত্যু দিলেন। যেখানে 'আল্লাহ্ কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' কর্ম-বাচক, আর ক্রিয়া হয় 'তাওয়াফ্‌ফা' সেখানে 'তাওয়াফ্‌ফার' অর্থ আত্মাকে নিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুদান করা, এ ছাড়া অন্য কোন অর্থ কখনো হয় না।

❖ ইবনে আব্বাস 'তাওয়াফ্‌ফিকার' অনুবাদ করেছেন 'মুমিতুকা' অর্থাৎ আমি তোমাকে মানুষের দ্বারা হত্যা করা থেকে রক্ষা করবো, তোমার জন্য নির্ধারিত পূর্ণ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো এবং তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব, তোমাকে নিহত হতে দিব না (কাশ্‌শাফ)।

❖ আরবী ভাষাবিদেরা ঐক্যমত পোষণ করেন যে উপরোক্তভাবে যখন 'তাওয়াফ্‌ফা' ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অন্যরূপ অর্থ কখনো হতে পারে না। সমস্ত আরবী সাহিত্যে এ শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না।

❖ অনন্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী স্বনামধন্য তফসীরকারক ইবনে আব্বাস, ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে হায্‌ম, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম, কৃতাদা, ওয়াহ্‌হাব এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ে একমত (বুখারী, তফসীর অধ্যায়, বুখারী, বাদাউল খাল্‌ক অধ্যায়, বিহার, আল্ মুহাল্লা, মাআ'দ পৃ. ১৯, মনসুর ২য়, কাসীর)।

❖ এ শব্দটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে, তেইশটি স্থলেই ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যুর সময় আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে। কেবলমাত্র দু'টি স্থলে ঘুমের মধ্যে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুই স্থলে 'ঘুম' ও 'রাত্রি' শব্দ ব্যবহার দ্বারা 'তাওয়াফ্‌ফাকে' বিশেষিত করা হয়েছে (৬:৬১, ৩৯:৪৩)।

❖ এ সত্যকে চাপা দিবার কোনও সুযোগ নেই যে ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। রসূলে করীম (সা.) স্বয়ং বলেছেন, 'মুসা ও ঈসা যদি এখনো জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা আমার অনুসরণ ও অনুগমন করতে বাধ্য হতেন' (কাসীর)। এমন কি তিনি বলেছেন, ঈসা (আ.)-এর বয়স ছিল ১২০ বৎসর (কান্‌যুল উম্মাল)।

❖ কুরআনের ৩০টি আয়াত ঈসা (আ.)-এর আকাশে গমন ও সেখানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করার অলীক ধারণাকে একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

'রাফাউন' অর্থ কারো মর্যাদা ও পদবী উন্নীত করা, সম্মান বৃদ্ধি করা। যখন 'রাফাউন' (মর্যাদার উন্নতি) আল্লাহ্‌র দিকে হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ কোন সসীম স্থানে সীমাবদ্ধ নন, কোন বস্তু-বিশেষও নন। অতএব দৈহিক ভাবে তাঁর দিকে উচ্চারোহণ কোন মতেই সম্ভব নয়। এ শব্দটি মর্যাদাবৃদ্ধি অর্থে কুরআনের ২৪:৩৭, ৩৫:১১ আয়াতদ্বয়েও ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আ.)-এর মর্যাদায় উচ্চারোহণ এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা মিথ্যা দাবী করেছিল যে তারা ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করে অভিশপ্ত বলে প্রমাণ করেছে। কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ.) ক্ষণিকের জন্যও অভিশপ্ত হতে পারে না, বরং মর্যাদায় উচ্চ হতে আরো উচ্চে উন্নীত হন।

হযরত ঈসা (আ.) ছাড়াও অন্যান্যদের জন্য 'রাফা' শব্দের ব্যবহারঃ

❖ রাফা'য়া বা'যাকুম ফাওকা বা'যেন দারাজাতেন' (সূরা আনআম: ১৬৬)

অর্থ- তোমাদের মধ্যে কাহাকেও অন্যদের চাইতে উচ্চতর মর্যাদা দ্বারা উন্নীত করিয়াছেন।

❖ "ওয়া রাফা'নাহু মাকানান আলীয়া" (মরিয়াম: ৫৮)

অর্থ- তাঁহাকে উচ্চ মোকামে উন্নীত করিয়াছেন।

❖ "ইয়ারফায়ুল্লাহু ল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাতেন"। (মুজাদিলাঃ ১২)

অর্থ- যাহারা ঈমানদার ও জ্ঞানী তাহাদিগকে আল্লাহ্ 'রাফা' দান করিবেন।

❖ সূরা নুর ঃ ৩৭ এবং সূরা ফাতের ঃ ১১ আয়াতে ব্যবহৃত 'রাফা' দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে– আকাশের কথা বলা হয় নাই।

❖ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নামাযের দুই সিজদার মাঝে দোয়া করেছেন 'ওয়ারফা'নী' বলে, অর্থ- 'এবং আমাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করো'। যদি 'রাফা' শব্দের অর্থঃ সশরীরে আসমানে যাওয়া হয়ে থাকে তবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য উহা অবশ্যই অবধারিত হতো।

❖ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

'মান তাওয়াযায়লিল্লাহি রাফা' হুল্লাহু' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নত হয় আল্লাহ তা'লা তাকে রাফা' দান করেন।'

❖ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ

"ইয়া তাওয়াবা আল্ আব্দু লিল্লাহী রাফায়াল্লাহ ইলাস সামায়িস সাবিয়াহ্" অর্থঃ যখন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য বিনত হয়, আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সপ্তম আসমানে 'রাফা' দেন (কাঞ্জুল উম্মাল)। 'রাফা' অর্থ যদি সশরীরে আসমানে উঠে যাওয়া হয়ে থাকে তবে দুনিয়ার সকল সিজদাকারীর আসমানে উঠে যাওয়া উচিত ছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

ইবনে মরিয়ম মারগিয়া, হক কি কস্‌ম। "দাখেলে জান্নাত হুয়া উয়াহ মোহাতারম"। (দুররে সামীন)। অর্থঃ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহতা'লার কস্‌ম। জান্নাত–বাসী হয়েছেন তিনি মোহাতারম (মহা সম্মানীত ব্যক্তি)।

[চলবে...]

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আমার লেখার বিষয়বস্তুর নামকরণ করা হয়েছে 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা'। অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা যুদ্ধ বাধাচ্ছেন, যুদ্ধকে উৎসাহিত করছেন, যুদ্ধ করতে গিয়ে উল্লাস বোধ করছেন তাদের জন্য যুদ্ধ, খেলাই বটে। তাদের আছে জনবল, অর্থবল, বাহুবল। আরো আছে উন্নততর মারণাস্ত্র, অর্থের প্রাচুর্যতা, জ্ঞানের সমারোহ আর জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ। সুতরাং এসব দেশের শাসকগণ আছে নিজ খোশ মেজাজে যুদ্ধ করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। তারা যদি যুদ্ধই না করলেন, তবে কেন তারা মহাশক্তিধর দেশের শাসন কর্তা? তাদের আর কাজ কী? সুতরাং অন্য সব খেলার মত যুদ্ধও তাদের একটি মজার খেলা। তাই যুদ্ধ তাদের সৌখিন খেলা।

কিন্তু যাদের এতসব সম্পদ নেই, রণসম্ভার নেই, নেই শক্তি ও সামর্থ্য। যেদেশের লোকদের ঘরে ভাত নেই, বাতিও নেই সেদেশের লোকদের বেলায় যুদ্ধ হচ্ছে–

ভয়ঙ্কর ধ্বংস, সর্বনাশের শেষ, ভয়াবহ ক্ষতি আর অসম্ভব দূর্গতি। লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার। মানব রক্তের বহমান স্রোত। মানব নামের দানব ছোবলে প্রলয় সাধন। অর্বুদ শিশুর পঙ্গুত্ব বরণ। এমন বিভীষিকাময় অবস্থার নামই হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ এরূপ হীনকর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বলতে ধ্বংস লীলা। অসংখ্য মৃত্যু। অমানসিক কষ্ট। কেবলই আহাজারী আর আর্তনাদ। কেবলই হাহাকার আর কান্না। এমন বিভৎস দৃশ্য কারোরই কাম্য হতে পারে না। কখনো নয়। যে এ খেলার খেলোয়াড় সে দানব। সে নরাধম, অসভ্য বর্বর, সে নিকৃষ্ট। সে ইতর প্রাণীরও অধম। কারণ ইতর প্রাণীও ধ্বংসের ভয়াবহতাকে ভয় পায়। এর অকল্যাণ জীবনকেই অনিরাপদ করে, চরমভাবে বিষিয়ে তোলে। প্রাণ বাঁচবার ঠাঁই পায় না। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নির্বিবাদে প্রাণীকূল মৃত্যুবরণ করে। 'হে যুদ্ধ খেলোয়াড় কুজন! তুমি নিপাত যাও। তুমি মানুষ নামের কলঙ্ক। তুমি নিকৃষ্ট চরিত্রের খুনী। তুমি কভু মানব নহ, তুমি অমানুষ।' এক্ষেত্রে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন বলে, 'ভূমন্ডলে ও ভূস্থলে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র' (২:১৮৫)। কুরআনের এ বাণী অন্য ধর্মাবলম্বীর কেউ স্বীকার করুক বা না-ই করুক তথাপিও তা অসাধারণ সত্য। এটা খোদার অমর বাণী। সুতরাং এ সত্য কারোর দ্বারাই অস্বীকার্য হতে পারে না। অতএব এ কথাই দাঁড়ালো যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহের বস্তু নিচয় সবই আল্লাহ্‌র। যদি তা-ই হয়, তাহলে এ সম্পদসমূহকে ধ্বংস করার অধিকার কারো নেই। এরূপ ধ্বংস সাধন অসম্ভব অপকর্ম। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ হলো, তোমরা পরস্পরের কল্যাণে যা খুশী, যেমন খুশী, যত খুশী, যেভাবেই খুশী কেবল গড়ো কিন্তু ধ্বংস করো না এর কিছুই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ বলছেন, (শুন!) যদি তোমরা নেক কাজ কর তা হলে তোমরা এ সৎকাজ দ্বারা নিজেদের আত্মারই কল্যাণ করবে এবং যদি তোমরা মন্দ কাজ কর, তা হলে এর জন্য (তোমাদের আত্মার অকল্যাণই করবে).....' (১৭:৮)। যুদ্ধ মানুষের অকল্যাণ সাধন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুদ্ধের কাজ কেবল একটাই, ধ্বংস কর প্রলয় সদৃশ। মানুষ মার কাতারে কাতার। সুতরাং এ ভয়ানক বিপর্যয় সাধন কুজন ব্যতীত কারোরই কাম্য হতে পারে না।

হে বিকৃত মস্তিষ্কের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ! এহেন জঘন্য ধ্বংসযজ্ঞে কভু উৎসাহিত হয়ো না। যুদ্ধ, বহুদিনের বহুজনের বহু সাধনায় গড়া সভ্যতাকে সমূলে ভেঙ্গে শ্রীভ্রষ্ট করে। বিমল পরিবেশকে বিনাশ করে দেয়। আর মানুষের আবাসভূমিকে শ্মশানে পরিণত করে ফেলে যা বহুদিন ধরে বিরাজ করে আর বহু মানুষের কষ্টের কারণ হয়। শোকের কান্নায় অশ্রু ঝরে বিরামহীন ধারায়। নিরীহরা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ব্যথিত চিত্তে খোদা সকাশে আর্তনাদ করে তোমাদের জন্য অমঙ্গল কামনা করে। জ্ঞান সমৃদ্ধ চক্ষুগুলি হয় অন্ধ, নিরপরাধ শিশুর পা-দুটি হয় খোঁড়া, সবুজ ফসলে ভরা মাঠগুলি পরিণত হয় বিরাণ ভূমিতে। বহু সন্তান হয় মাতৃহারা আর বহু মাতা হন সন্তান হারা। ফলে বায়ুতে– বাতাসে ভাসে হাজার মানুষের পচাগলা লাশের উৎকট গন্ধ। খাদ্য নাই, পানি নাই, নাই চিকিৎসা দানের ব্যবস্থা আর বস্ত্র। আরো যে কত কিছু নাই তার ইয়াত্তা নাই।

তবুও প্রয়োজন যুদ্ধের? তবুও যুদ্ধ করার অভিলাষ? এরপরও যুদ্ধ চাই? যুদ্ধের এমন ভয়ঙ্কর পরিণতির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমাদের অন্তরের যুদ্ধাবাজ নেশা দূর হয় নি? তবুও বর্বর যুদ্ধ বিলাসী যোদ্ধাগণ এরূপ ধ্বংসাত্মক অপকর্ম সাধন হতে বিরত না হলে তাদেরকে অভিশাপ। খোদার নৃশংস লানত বর্ষিত হোক এমনসব বিমূঢ় বদ-আত্মা সমূহের ওপর।

হে যুদ্ধাবিলাসিগণ! যুদ্ধ কি কখনো কোন সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? না কখনো কোন বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে পেরেছে। এমন নজীর কী আমাদের কারোর স্মরণে আছে? জিঘাংসার ক্ষোভ, অহংকার, বড়ত্বের বড়াই, শক্তির প্রতিযোগিতা, প্রতিপত্তি লাভের অদম্য নেশা, প্রতিহিংসার উন্মাদনা, রাজ্য দখল লোভ ইত্যাদি অনৈতিক চেতনার শিকারে পরিণত হওয়ার ফলেই যোদ্ধার এ হীন অভিলাষ। পৃথিবীর অনেক নেতাই আজ এই বেরামে আক্রান্ত হয়ে অধুনা পৃথিবীতে

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র হাতে বিশ্ব-মাঠে মহড়ায় নেমেছেন। এ সুযোগে কেউ অস্ত্রের বাজার বসিয়েছেন, কেউ সেই অস্ত্র খরিদ করছেন। কেউ কাউকে সেসব কেনার জন্য প্রলুব্ধ করছেন। কেউ তা কিনে হিম্মত প্রকাশ করছেন। কেউ সেসব অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বীয় সৈন্যদের সুকৌশলী করছেন। কেউবা আবার শত্রু দেশে এর ব্যবহার দ্বারা কত মানুষ নিধন হয় তা পরীক্ষা করছেন। ফলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা এখন বাস্তব যুদ্ধে পরিণত হতে চলছে।

হে দর্পকারী যোদ্ধাগণ! যুদ্ধ যাদের প্রিয়, তোমাদেরকে বলছি, আমরা যারা শান্তি প্রিয় শান্ত মানুষ, আমরা যুদ্ধকে ভয়ঙ্করভাবে ভয় পাই। যুদ্ধের নাম শুনলেই আমাদের শান্তিপ্রিয় আত্মা আঁতকে উঠে। আমরা সারাক্ষণ ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকি, না জানি কে কার ঘরে কী অঘটন ঘটিয়ে বসে। কখন কে কোন্ দেশের মানুষদের মেরে রক্তের প্লাবন বইয়ে দেয়। পিতা-মাতা ও সন্তান সজনের বিরহের সন্তাপ শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। তোমরা আমাদেরকে অহেতুক মারার কলঙ্ক কর্ম করো না। মানব বসতির শান্তিময় আবাসভূমে অহেতুক বিভ্রাট ঘটিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করো না। পৃথিবীতে খোদার পক্ষের যতসব সতর্ককারীই এসেছেন তাঁরা অধার্মিকদের দ্বারা নির্যাতীতই হয়েছেন, কখনো নির্যাতন করেন নি। তাঁরা অত্যাচারিত ছিলেন কিন্তু কখনো কাউকে অত্যাচার করেনি। তাঁরা উগ্র মনের ধ্বংসকারীদের কখনো ধ্বংস করার শিক্ষা দেন নি। তাঁরা কখনো এরূপ যুদ্ধকে উৎসাহিত করেন নি। এক্ষণে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে আমরা সবাই সেসব মহান আদর্শবাদী স্বর্গীয় বাণী প্রচারকদের আদর্শের অনুসারী। সুতরাং আমরা অন্যায় যুলুম আর অহেতুক মানুষ মারার মত অপকর্ম করতে পারি না। তা কখনো উচিতও নয়। বিবেকের মানদন্ডে এটা নিতান্তই গর্হিত কাজ। যদিওবা কোন দৈব কারণে পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সাথে মনের অনৈক্য হয়েই যায় তবে তা স্বীয় আদর্শ সুলভ স্বভাবের গুণে মিমাংসা করে নেয়াই শ্রেয়। সব ধর্মাবলম্বীর জন্য সব ধর্মেরই এরূপ শিক্ষা বিদ্যমান। এরজন্য আমরা সাধারণ নিরীহ জনগোষ্ঠীকে জিম্মী রাখতে পারি না। এমনটি নৈতিকতার প্রবল বাধা। রাজার সাথে মতানৈক্যের ক্ষোভ মেটাতে গিয়ে রাজ্যের ক্ষতি করতে পারি না। শান্তি বিনষ্ট করে শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রাণনাশ করতে পারি না। যুদ্ধ বাধিয়ে সবকিছু ধ্বংস করতে পারি না। এটা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক কাজ।

হে শক্তিধর শাসকবৃন্দ! তোমাদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, তোমরা এমন দুষ্কর্ম হতে পিছিয়ে আস। রণতরী নিয়ে রণক্ষেত্র হতে বিনম্র চিত্তে স্বগৃহে ফিরে আস। তাহলে পৃথিবী তোমাদেরকে সম্মাননার সনদ দান করবে। পৃথিবীকে ভালবাস। এতে বিচরণকারী সকল প্রাণিকে স্নেহ কর। ধ্বংসের ভয়াবহতাকে ভয় কর। যুদ্ধের মত অপকর্মের দ্বারা পরস্পরের মতবিরোধ কখনো মতৈক্যে পরিণত হতে পারে না। পরন্তু বিবাদ চরমে পৌঁছে। পরিণামে তোমরা তোমাদের দ্বারা সাধিত প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বর্বর চরিত্রের মানুষ বলে কুখ্যাত হতে থাকবে। অতঃপর যুগান্তরকাল ব্যাপী মানুষ তোমাদেরকে ধীকৃত করবে।

এ পর্যায়ে তোমাদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, তোমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাকে বন্ধ কর। পৃথিবীকে ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার পরিস্থিতি হতে রক্ষা কর। হিংস্র স্বভাবকে বিনম্র কর। সুপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ সুমানুষ হও। তাকিয়ে দেখ, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ খাদ্য না খেয়ে, সুপেয় পানি না পেয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে। শয্যাস্থানের অভাবে সারারাত নির্ঘুম থাকছে। তোমরা বরং এমন অসহায়দের সৌজন্যে কিছু কর। তাদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ত্রাণ দানে এগিয়ে আস। এ আশায় ও প্রত্যাশায় বহুদিন থেকে তারা তোমাদের পানে তাকিয়ে আছে। সুতরাং তোমরা তাদের পাশে দাঁড়াও। তাদের হয়ে তাদের জন্য কিছু কর। একটি অস্ত্রের মূল্যে একশ' লোকের একশ বছরের খাবার হবে, যেমনটি এখন অতীব প্রয়োজন। সুতরাং ভেবেছ কী এতসব যুদ্ধাস্ত্রের মূল্যে কত লোক কত বছর কত সুখে থাকবে? যদি এমনটিই হয় তবে যুদ্ধ করার মত কোন সমস্যা আর কখনো থাকবে না। এমনই প্রয়াসে খোদার পক্ষ থেকে আগত এক সুমহান ব্যক্তি সুদীর্ঘ দিন ধরে বিস্তর কিছু করার আয়োজন করেছে। তিনি যুদ্ধকে রহিত করার আদর্শ অবলম্বনে সবার মঙ্গল সাধনার মানসে অজস্র কাজ করার প্রোগ্রাম করেছেন। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন, ঘৃণা কাউকেও নয়, মঙ্গল সবার মঙ্গল। যুদ্ধ কারোর জন্যই নয়। এমন সুনীতি অনুসরণে সবার মঙ্গল করছেন। তোমরা বরং তাঁর সকাশে আস। সব মানুষের ভালবাসায় সব কিছু কর। তবেই আল্লাহ্ সবার সহায় হবেন। যুদ্ধ খেলার ধ্বংস ছাড়াই পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হবে। পৃথিবীর সব কিছুই সব মানুষের জন্য হবে। আল্লাহ্ তার মনোনীত ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয় মু'মিনদের মুক্তি এটাই যে, যখন তাদের মধ্যে কোন কিছুকে মিমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। প্রকারান্তরে এরাই হবে সফলকাম এবং যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তার তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য হয়। (২৪:৫২-৫৩) স্মরণ রেখো, আমার দায়িত্ব কেবল তোমাদের সমীপে এ সুসংবাদটুকু পৌঁছে দেয়া। অতঃপর তা মান্য করা আর না করা তোমাদের দায়িত্ব।

তাই বলছি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আর নয়। যে নেতৃত্বে বিশ্বের তাবৎ মানুষের জন্য মঙ্গল সাধন সম্ভব তার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই পৃথিবীর জন্য হিত। হে বিশ্ব বিবেক! যুদ্ধকে ভয় কর। যুদ্ধ মানেই প্রজ্জ্বলিত আগুন! এই অহিত কর্ম, প্রলয় সদৃশ ধ্বংস বৈ মঙ্গল কখনো করেনি। এই বাক্য চিরন্তন সত্য। খোদা কর্তৃক মনোনীত মহান মানব মুমিনদের মনিব আহমদীয়াতের খলীফা কাতর চিত্তে তোমাদের সবাইকে ডাকছেন সব মানুষের জন্য যত সব মঙ্গল তা সাধন করতে। তোমরা তোমাদের সব চেষ্টার দ্বারা তাঁর সব কাজের সাহায্যকারী হও। শুধু তোমার আমার জন্যই নয়, বরং পৃথিবীর সব মানুষের জন্য এটাই হবে সুমহান কাজ। "তোমরা ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হও। তবেই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে স্বর্গীয় সালাম। কিন্তু যদি মিথ্যারোপকারী বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তা হলে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানির দ্বারা এবং জাহান্নামের দহন" (আল কুরআন ৫৬:৯১-৯৫)।

নিশ্চয় অস্বীকারকারীরা কখনও সফলকাম হয় না

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

বিশ্বজুড়ে আহমদীয়াতের বিরোধিরা আহমদীয়াতকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে চায়। বিশেষ করে পাকিস্তানবাসী মোল্লা এবং তাদের অনুসারীরা শতাধিক বৎসর ধরে তাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা যুলুম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে। মূলত: তারা যে প্রকৃত ইসলামের বিরোধিতা করছে তা তারা বুঝতে পারছে না। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা তাদের খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে খতমে নবুওয়তেরই বিরুদ্ধাচরণ করছে, সে বিচার বোধ ও প্রজ্ঞা তাদের নেই। আল্লাহ্ পাক সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নীতি আদর্শও হুবহু পবিত্র কুরআনই যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "এবং এটাই সর্বশেষ (অর্থাৎ চিরস্থায়ী) শিক্ষা। এর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন অবৈধ। আর সে কারণেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ খাতামান নাবীঈন। অতীত নবীদের যাবতীয় মৌলিক শিক্ষা পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করছে এবং ভবিষ্যতের বিচ্যুতি হতে রক্ষার দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার হেফাজতের জন্য আল্লাহ্ পাক যাকে প্রেরণ করেছেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত, প্রকৃত অনুসারী ও দাস এবং তিনি উম্মতি নবী বা দাস নবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামিয়তের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, এমন কোন কথা মুসলমানের পক্ষে মেনে নেওয়া আত্মঘাতী বৈ আর কিছু নয়। বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন তা পবিত্র কুআন পরিপন্থী অলীক বিশ্বাস। এটা খৃষ্টানদের আকিদা। পবিত্র কুরআন বলে, "এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে।" (২১:৩৫)। **'খাতামান নাবীঈন'**-এ প্রকৃত বিশ্বাসী যারা তারা অবশ্যই পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী। অন্যথায় তারা না কুরআন আর না খাতামান নাবীঈনে বিশ্বাসী।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না।" (৬:২২)

একটু চিন্তা করুন, দীর্ঘ শতাধিক বৎসর যাবৎ যালেমগণ সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও যুলুম নির্যাতন করেও কি আহমদীয়াতকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে? পক্ষান্তরে দিনের পর দিন আহমদীয়াত সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে চলেছে। "আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব" আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা যা তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে। "তুমি বল নিশ্চয় আমি তোমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর আছি– তথাপি তোমরা উহাকে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ" (৬:৫৮)। খাতামান নাবীঈনে বিশ্বাসী খায়রে উম্মতরা কি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিপরীত রায় দিতে পারে? "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে; যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাহার নাম লইতে বাধা দেয় এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়?" (২:১১৫)। কারা আজ মসজিদ ধ্বংস করার এবং আহমদীদের হত্যা করার চেষ্টা করছে? তারা কি প্রকৃত কুরআনের অনুসারী? মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল আত্মরক্ষার্থে, জোর পূর্বক ইসলামকে বিস্তারের জন্য নয়। বল প্রয়োগের অভিযোগ ছিল বিজাতীয়দের কিন্তু কি আশ্চর্য মুসলমানদেরই একটি অংশ এখন বিজাতীয়দের মিথ্যা অভিযোগের সমর্থনে কাজ করে যাচ্ছে।

পবিত্র কুরআন বলে, যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ

আল্লাহ্‌র ওপর যুলুম করা হইতেছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (৬:৪১) "যাহাদিগকে তাহাদের ঘর বাড়ি হইতে অন্যায় ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হইয়াছে যে, তাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে সাধু সন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয় অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত।" (২২:৪১) কারা আজ পবিত্র কুরআনের নীতি লঙ্ঘন করছে? বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল শক্তি বলে নয়, আল্লাহ্‌র সাহায্যে। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের নির্দেশে সাহাবীরা নিজেদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং এ ছিল এক অগ্নি-পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আর আজ মুসলমানদের একটি অংশ আল্লাহ্‌র সমর্থন (কুরআনের) ছাড়াই নিজেদের শক্তি বলে যুদ্ধ করে ধ্বংস হচ্ছে। এ ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হল। "এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের মাধ্যমে (লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া) কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অত:পর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে, সেই বাণীর সত্যায়ণ করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার ওপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।" (৩:৮২) এবং "সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ পথ নির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যাবাদীদের) হইতে পারে?" (১১:১৮)

প্রতিশ্রুত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই আল্লাহ্ প্রেরিত সেই সাক্ষী। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "আমি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি। তিনি ভাল করে জানেন যে, আমি মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক নই। তোমরা যদি আমার খোদা তা'লার কসম খাওয়া এবং ঐ নিদর্শন সমূহ যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন তা দেখার পরও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি তোমাদেরকে খোদা তা'লার কসম দিচ্ছি, এমন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'লার ওপর প্রতারণা এবং মিথ্যা আরোপ করছে তথাপিও আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।" (লেকচার লুধিয়ানা)। পবিত্র কুরআন বলে, "যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী" (৮:৪৩)। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে যুগ-মামুরকে মান্য করে ইসলামের বিশ্ববিজয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন, আমীন।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক
'আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে
'আহমদী' পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.theahmadi.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে সম্প্রীতি দিবস পালিত

গত ১০/০১/২০২০ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে এক সম্প্রীতি দিবস অনুষ্ঠান মসজিদ 'বাইতুল বাসেত' চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পেশ করার মাধ্যমে এই মহতি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের জেলা নাযেম জনাব খালেদুর রহমান ভুঞা সাহেব । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের সম্মানিত আমীর মোহতরম মোর্শেদ আলম সাহেব। এই সম্প্রীতি দিবস অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জামাতের সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নবাগত আনসার সদস্যদের ফুল ও মসীহ্ (আ.)-এর বই উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফুজ্জামান সাহেব, জনাব জাফর আহমদ সাহেব (মুরুব্বি সিলসিলা), জনাব হাসেম সাহেব, জনাব শাহাবুদ্দিন সিহাব সাহেব প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল
মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম

নাসেরাবাদ জামাতে নববর্ষ পালিত

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ইং তারিখে বাজামাত এশার নামায পড়ার পর অত্র জামাতের আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল মিলে ২০ জন সদস্য মসজিদে অবস্থান করে তথায় রান্নাকৃত মাংস ও ভাত খাবার পর মসজিদেই রাত অতিবাহিত করা হয়। রাত ৪.৩০ (সাড়ে চারটায়) বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়। অতঃপর দোয়া দরূদ পাঠ করার পর বাজামাত ফজরের নামায পড়া হয়। সকালে ওয়াকারে আমল করা হয়। অতঃপর তথায় রান্নাকৃত খিচুড়ি খেয়ে সবাই মসজিদ হতে নিজ নিজ বাড়ি যায়।

জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাসেরাবাদ

শোক সংবাদ

অতীব দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাসেরাবাদ এর ওসীয়্যতকারী সদস্য এ.এইচ. এম জহির উদ্দিন গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ইং তারিখে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে বিকাল ৫.৩০ (সাড়ে পাঁচ) টায় মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। তিনি প্রথমে জামাতের অংগসংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নাসেরাবাদ এর কায়েদ, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম এবং পরবর্তীতে জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন করা হলো।

জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাসেরাবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনে প্রথমবারের মতো ৬৫টি ভাষায় বিরল কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে যাচ্ছে। ১০ জানুয়ারী ২০২০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার যতীন্দ্রনগরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে ৪দিন ব্যাপী ৬৫টি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন লণ্ডন প্রবাসী সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম ভূইয়া সাহেব। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। গত ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কুরআন প্রদর্শনী চলমান ছিল। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল এবং স্থানীয় আমীর জি. এম. মোবারক আহমদ সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রদর্শনীটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব ছিলেন এই কুরআন প্রদর্শনীর পরিচালক। সুন্দরবন জামাতে এই প্রথমবারের মতো পবিত্র কুরআনের ৬৫টি ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদর্শনীর আয়োজন করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এটি নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের বিরল এক প্রদর্শনী।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখন পর্যন্ত ৭৬টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব বলেন, 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে চলেছে। ভাষাবিদদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ ভাষায় মানুষ কথা বলে থাকে। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ৭৬ ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ

প্রকাশ করেছে। এছাড়া আরো অনেক ভাষায় অনুবাদের কাজ চলমান আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীগণ এই অনুবাদ পড়ার পর ইসলাম সম্বন্ধে তাদের ভুল ধারণা দূর হচ্ছে, এমনকি স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারীরা এর প্রভাবে নিজ থেকে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করছেন। আমরা চাই, প্রতিটি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে দিতে। আমরা এবার ৬৫টি ভাষায় অনূদিত কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। যে কেউ এসে আন্তর্জাতিক মানের এ কুরআন প্রদর্শনী থেকে উপকৃত হতে পারেন।'

কুরআন প্রদর্শনীর পরিচালক মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব বলেন, 'এ প্রদর্শনী দেখতে আসা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ প্রদর্শনীর পদক্ষেপকে কুরআনের গুরুত্ব উপলব্ধি ও এর প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার এক মহাসুযোগ হিসেবে মনে করছে। আমাদের এই প্রদর্শনীতে বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ, মাওরি, জুলা, মেনডি, ওরিয়া, ইয়াউ, কিকাম্বা, কাটালান, টভালুয়ান, হিন্দু, গ্রিক, ইটালিয়ান, জাপানী, চাইনিজ, ফ্রেন্স প্রভৃতি ভাষাসহ মোট ৬৫টি ভাষায় অনুবাদকৃত কুরআন প্রর্দশীত হচ্ছে। আপনাদের সকলের এখানে সাদর আমন্ত্রণ রইলো।'

এই কুরআন প্রদর্শনীতে শ্যামনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ২ জন সাথীসহ পরিদর্শন করতে আসেন। এছাড়া সাত জনের একটি সাংবাদিক দল এটি পরিদর্শন করেন। প্রভাষক মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান সাইদ, ভাইস চেয়ারম্যান ও স্বেচ্ছাসেবক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এতে অংশগ্রহণ করেন। শ্যামনগর উপজেলা মহিলা আওয়ামীলীগ সহ সম্পাদিকা মোসাম্মাৎ ডলি আক্তার সাহেবা এই প্রদর্শনী দেখে বলেন, 'এটি একটি বিরল প্রদর্শনী। আমরা কখনও এমনটি দেখি নি। এটি কিভাবে সম্ভব? এই শীতের রাতে আমার কষ্ট করে আসাটা সার্থক হয়েছে। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ধন্যবাদ জানাই কেননা তারা একটি অসাধ্য কাজকে সাধ্যে পরিণত করেছে।' এছাড়া স্থানীয় অনেক পথিক এবং আলেম সমাজ এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৩ জানুয়ারী সোমবার বাদ আসর উপজেলা জেলা চেয়ারম্যান জনাব আতাউল হক দোলন ১০ জন সহকর্মী নিয়ে এই কুরআন প্রদর্শনী প্রদর্শন করতে আসেন। তারা সবাই আহমদীয়া মুমলিম জামাতের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। ৪ দিনের এই কুরআন প্রদর্শনীর মোট উপস্থিতি সংখ্যা ১৬ শ'র অধিক। আর প্রায় ৬ শ'র অধিক অ-আহমদী ব্যক্তিবর্গ এটি প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'লা এই কুরআন প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলের নিকট সত্যকে উন্মোচন করুন, আমীন।

শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম- ওয়াকফে জাদীদ

এই বিরল কুরআন প্রদর্শনীটি বেশকিছু পত্রপত্রিকায় সংবাদ আসে।
তারই একঝলক নিচে উপস্থাপন করা হল–

আলোকিত প্রতিদিন

৬৫টি ভাষায় অনুদিত পবিত্র কোরআনের বিরল প্রদর্শনী

আকাশছোঁয়া

৬৫টি ভাষায় অনুদিত পবিত্র কোরআনের বিরল প্রদর্শনী

Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges

Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO.: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

পত্রদূত

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা

দক্ষিণের মশাল

শ্যামনগরে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ৬৫ ভাষায় অনূদিত কোরআন শরিফ প্রদর্শনী

সাতক্ষীরা প্রতিদিন

আপনার পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
যোগাযোগ: ০১৭১৬-৮৩৯৮৩১, ০১৭১৯-৭১৬০৭০

৬৫ ভাষায় অনুবাদিত পবিত্র কোরআন প্রদর্শনীর শেষ দিন আজ

রাকিবুল হাসান

প্রকাশিত সময় : রবিবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২০

শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের যতীন্দ্রনগর গ্রামস্থ আহমদীয় মুসলিম জামাত কর্তৃক ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত ৪ দিন ব্যাপি পবিত্র কোরআন প্রদর্শনীর আজ শেষ দিন।

অনুবাদিত ভাষা সমূহ যথাক্রমে-বাংলা, মানদিকা, মনিপুরী, উর্দু, সির্বিয়ান, কড়িয়ান, কান্নাড়া, লুগান্ডা, পশতো, নরওয়েজিয়ান, ইউরোবা, গুজরাটি, মারাঠী, চাইনিজ, কিকুয়া, ডেনিশ, তামিল, সিন্ধি, ইটালিয়ান, কাশ্মিরী, হিন্দী, হাওসা, কেটোলান, সোহেলী, থাই, টগালো, সুইডিশ, নেপালী, গ্রীক, তেলেগু, মানডি, জার্মান, ওড়িয়া, উজবেক, গুলিশ, কিকামবা, জাপানিজ, ভিয়েতনামিজ, আসামিজ, টার্কিশ, টুভালোয়ানা, কোরিয়ান, পলিশ, চেক, ডাচ, ইটালিয়ান, মালায়ালাম, বসনিয়ান, সারাকিকী, গুলোক, ফ্রেন্স, ইগবো, জুলা, পর্তুগীজ, সিনহলিজ, ইংলিশ, বসনিয়ান, স্পেনিশ, মওরিটিয়ান, পাঞ্জাবী, পার্সিয়ান, আলবেনিয়ান, আশান্তি, বার্মিজ এবং মাসে।

সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত-এর আমীর জি.এম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন, আহমদীয় মুসলীম জামাত-এর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, যুক্তরাজ্য ও ন্যাশনাল আমীর মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা নুরুল আমীন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। এসএম মতিউর রহমান, জি.এম আবু দাইন, মাওলানা আমীর হোসেন, শ্যামনগর উপজেলা প্রেস ক্লাবও সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, মাওলানা নুরুল আমীন জানান, বর্তমানে পৃথিবীর ২১৪টি দেশে আহমদীয় মুসলীম জামাতের কার্যক্রম চলছে। যার সদস্য সংখ্যা-১কোটি ২০ লক্ষ।

দৈনিক সুপ্রভাত সাতক্ষীরা
www.suprovatsatkhira.com

জানুয়ারি ১৩, ২০২০

শ্যামনগর ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত ৪ দিনব্যাপী পবিত্র কোরআন প্রদর্শন

শ্যামনগর প্রতিনিধি: সাতক্ষীরার শ্যামনগরে উপজেলার মহীচ্ছদাপুর গ্রামে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক অনুবাদিত ৪ দিন ব্যাপী পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী। সোমবার(১৩ জানুয়ারি) বিকাল কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদিত বিভিন্ন দেশের ভাষা সমূহ যথাক্রমে- বাংলা, মালদিকা, মণিপুরী, উর্দু, ফিজিয়ান, কোরিয়ান, কমনাডা, ইউরোবা, ইংলিশ, বসনিয়ান, মওরিটিয়ান সহ সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত- আমীর জি,এম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আহমদীয় মুসলীম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মাও: ফিরোজ আলম, যুক্তরাজ্য ও ন্যাশনাল আমীর মাও: আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন মাও: নুরুল আমীন, মতিউর রহমান, মাও: আমীর হোসেন, শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম,কামরুজ্জামান, সাবেক উপদেষ্টা আবু সাইদ, সাবেক সভাপতি মনজুর আলম, সামিউল ইসলাম মন্টি প্রমুখ।

21 SHARES | Share on Facebook | Tweet | Follow us

0 Comments

সম্পাদক ও প্রকাশক : এ কে এম আনিসুর রহমান
পলাশপোল (চৌধুরী পাড়া) সাতক্ষীরা ৯৪০০।
বার্তা বিভাগ: ০৪৭১-৬৪৭৬৩ মোবাইল: ০১৭১১
বিজ্ঞাপন: 01705146774 সার্কুলেশন: ০১৭৪
suprovatsatkhira@gmail.com

বিডিজাহান

Home › সারাদেশ

সাতক্ষীরায় ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী

By bdjahannews

আবদুল্লাহ-আল ইসলাম সানী, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের মহীচ্ছদাপুর গ্রামস্থ আহমদীয় মুসলিম জামাত কর্তৃক ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত পবিত্র ৪ দিন ব্যাপী কোরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ছিলো শেষ দিন। অনুবাদিত ভাষা সমূহ যথাক্রমে-বাংলা, মালদিকা, মনিপুরী, উর্দু, ফিজিয়ান, কোরিয়ান, কান্নাডা, লুগান্ডা, পশতো, শাকহোরিয়ান, ইউরোবা, গুজরাটি, মারাঠী, তাইমিজ, কিকুয়া, ডেনিশ, তামিল, সিন্ধি, ইটালিয়ান, কাশ্মিরী, হিন্দী, হাওসা, কেটালান, সোয়েলী, থাই, টিগালো, সুইডিশ, বেঙ্গালী, গ্রীক, তেলেগু, মালয়ি, জার্মান, ওড়িয়া, উজবেক, রুশিয়, কিকাম্বা, আলবেনিয়ান, ভিয়েতনামিজ, আসামিজ, টার্কিশ, টুভালোয়ান, কোরিয়ান, পলিশ, চেক, ইয়াও, ইন্দোনিয়ান, মালায়ালাম, বসনিয়ান, সারাইকী, ওলোফ, ফ্রেঞ্চ, ইবো, জুলা, পর্তুগীজ, সিনহালিজ, ইংলিশ, বসনিয়ান, স্পেনিশ, মওরিটিয়ান, পাঞ্জাবী, পার্সিয়ান, আলবেনিয়ান, আশান্তি, বার্মিজ এবং মালে। সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত-এর আমীর জিএম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আহমদীয় মুসলীম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, মাওলানা ফিরোজ আলম, যুক্তরাজ্য ও ন্যাশনাল আমীর মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নুরুল আমীন, এসএম মতিউর রহমান, জিএম আবু সাঈদ, মাওলানা আমীর হোসেন, শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাব ও সুন্দরবন প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, মাওলানা নুরুল আমীন জানান, বর্তমানে পৃথিবীর ২১৪টি দেশে আহমদীয় মুসলীম জামাতের কার্যক্রম চলছে।

দেশের সংবাদ

HOME | HOME | বাংলাদেশ | জাতীয় | আন্তর্জাতিক | রাজনীতি | সারাদেশ | প্রশাসন | বিনোদন | মিডিয়া | লাইফস্টাইল | শিক্ষা

Home / ধর্ম / ৬৫টি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরআনের বিরল প্রদর্শনী

৬৫টি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরআনের বিরল প্রদর্শনী

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে যাচ্ছে।

১০ জানুয়ারি ২০২০ রোজ শুক্রবার সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মহিচ্ছদাপুরে আহমদিয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের জামে আয়োজিত কমপ্লেক্সে ৪দিন ব্যাপী ৬৫টি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরআন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন লন্ডন প্রবাসী সেন্ট্রাল বাংলাডেস্কের ইনচার্জ মাওলানা ফিরোজ আলম এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আমীর জিএম মোবারক আহমদ এবং মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

সুন্দরবনে এই প্রথম বারের মতো পবিত্র কোরআনের ৬৫টি ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদর্শনীর আয়োজন করে আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। এটি নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের বিরল এক প্রদর্শনী। এছাড়া আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি ভাষায় সম্পূর্ণ কোরআন অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা প্রিন্টিং পর্যায়ে আছে।

এ বিষয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বলেন, 'পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে চলেছে। ভাষাবিদদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ ভাষায় মানুষ কথা বলে থাকে। বর্তমানে আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রায় ১০০ ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এছাড়া আরো অনেক ভাষায় অনুবাদের কাজ চলমান আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীগণ এই অনুবাদ

আপনার পাশে, সব সময়
সাতক্ষীরার আলো

শ্যামনগরে ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত পবিত্র কোরআন প্রদর্শন

প্রকাশিত

শ্যামনগর/সাতক্ষীরা/সংবাদদাতা

শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের ষতীন্দ্রনগরে আহমদীয় মুসলিম জামাত কর্তৃক ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত ঐতিহ্যবাহী পবিত্র কোরআন প্রদর্শন।

রবিবার বিকাল কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদিত বিভিন্ন দেশিও ভাষা সমূহ যথাক্রমে- বাংলা,মালদিভা,মনিপুরী,উর্দু,ফিজিয়ান, কোরিয়ান, কানমাড়া, ইউরোবা, ইংলিশ, কাশমিরান, মওরিটিয়ান সহ সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত- আমীর জি.এম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আহমদীয় মুসলীম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মাওঃ ফিরোজ আলম, যুক্তরাজ্য ও ন্যাশনাল আমির মাওঃ আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী।

আরো উপস্থিত ছিলেন মাওঃ নুরুল আমীন, মতিউর রহমান, মাওঃ আমীর হোসেন, শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম কামরুজ্জামান, সাবেক উপদেষ্টা আবু সাঈদ, সাবেক সভাপতি মনজুর আলম, সাইফুল ইসলাম মন্টি প্রমুখ।

দৈনিক দৃষ্টিপাত
DAINIK DRISHTIPAT

শ্যামনগরে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত পবিত্র কোরআন প্রদর্শন

Posted in: বিশেষ নিউজ, শ্যামনগর, সব সংবাদ | Posted on: Jan 13, 2020 | No Comment

বিশেষ প্রতিনিধিঃ শ্যামনগর উপজেলার ষতীন্দ্রনগর গ্রামে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত ৪ দিন ব্যাপি পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকালে কোরআন শরীফ বাংলা সহ অনুবাদিত বিভিন্ন বিদেশি ভাষা সমূহ যথাক্রমে- মালদিভা, মনিপুরী, উর্দু, ফিজিয়ান, কোরিয়ান, কানমাড়, ইউরোবা, ইংলিশ, কাশমিরান, মওরিটিয়ান। সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত- আমীর জি.এম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আহমদীয় মুসলীম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মাওঃ ফিরোজ আলম, যুক্তরাজ্য ও ন্যাশনাল আমীর মাওঃ আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী। সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিদর্শন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক এস এম আতাউল হক দোলন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগ সহ সভাপতি অসিম কুমার মৃধা,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স. ম আব্দুস সাত্তার,মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সেলিনা সাঈদ, উপজেলা তাঁতী লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক মেহেদী হাসান মারুফ প্রমুখ।

OUR TIME
E-paper

Bangladesh

Exhibition of translations of Quran in Sunderbans

Published Time: January 13, 2020, 12:00 am
Updated Time: January 12, 2020 at 8:25 pm

DOT Desk: Translations of the Holy Quran in 65 languages have drawn public attention at an exhibition that began in Shyamnagar of Satkhira on Friday, reports New Age. The Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh organises the exhibition at its Sunderbans unit to portray the true message conveyed by the Muslim holy scripture, and to dispel common misconceptions about the Quran, said a release. Featuring a walk-in display, the exhibition included translations of the Holy Quran in 65 languages, as well as a selection of the Quranic verses in Bangla.

Firoz Alam, in-charge of Bangla desk of worldwide Ahmadiyya community, inaugurated the exhibition.

Speaking at the opening session, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh national amir Abdul Awwal Khan Chowdhury said, 'The worldwide Ahmadiyya community has so far translated the Holy Quran into nearly 100 languages. The reason for doing so is simple – to convey the true meaning of this revered book to the people of the world in a way that is easy for them to understand in their own language.'

'Unfortunately, both the opponents of Islam as well as some Muslim fanatics misquote cherry picked portions for their own goals. Our exhibition is meant to dispel these misconceptions and to highlight the true message of love and peace contained within this holy book,' he added.

The exhibition will continue till January 13 from 9:00am to 10:00pm.

ADVERTISE HERE
Get your message in front of the decision makers that count.

Wednesday, January 15, 2020
NEW AGE Bangladesh

Exhibition of translations of Quran i

Staff Correspondent | Published: 14:15, Jan 11, 2020 | Updated: 18:18, Jan 11, 2020

The Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh arranges an exhibition of translations of the holy Quran at the remote village of Jatindranagar in Shyamnagar of Satkhira. — Press Release

Translations of the Holy Quran in sixty-five languages have drawn public attention at an exhibition that began at the remote village of Jatindranagar in Shyamnagar of Satkhira on Friday.

The Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh organises the exhibition at its Sunderbans unit to portray the true message conveyed by the Muslim holy scripture, and to dispel common misconceptions about the Quran, said a release.

Featuring a walk-in display, the exhibition included translations of the Holy Quran in sixty-five languages, as well as a selection of the Quranic verses in Bangla.

Firoz Alam, in-charge of Bangla desk of worldwide Ahmadiyya community, inaugurated the exhibition.

Speaking at the opening session, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh national amir Abdul Awwal Khan Chowdhury said, 'The worldwide Ahmadiyya community has so far translated the Holy Quran into nearly 100 languages. The reason for doing so is simple – to convey the true meaning of this revered book to the people of the world in a way that is easy for them to understand in their own language.'

'Unfortunately, both the opponents of Islam as well as some Muslim fanatics misquote cherry picked portions for their own goals. Our exhibition is meant to dispel these misconceptions and to highlight the true message of love and peace contained within this holy book,' he added.

ইনিউজ ৭১

জাতীয় রাজনীতি রাজধানী সারাদেশ আন্তর্জাতিক অন্যান্য খেলাধুলা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

শ্যামনগরে ৬৫ ভাষায় অনুবাদিত কোরআন প্রদর্শনী

আসাদ মণ্ডল, নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঘটীভুক্ষ্যার গ্রামে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক অনুবাদিত ৪ দিন ব্যাপি পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

সোমবার(১৩ জানুয়ারি) বিকাল কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদিত বিভিন্ন দেশিও ভাষা সমুহ যথাক্রমে- বাংলা, মালয়িলা, মণিপুরী, উর্দু, ভিয়েতনাম, কারিয়ান, আফগান, ইউরোবা, ইংলিশ, বসনিয়ান, মওবিজিয়ান সহ সুন্দরবন আহমদীয় মুসলীম জামাত- আমীর জি,এম মোবারক আহমদের সভাপতিত্বে বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আহমদীয় মুসলীম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মাওঃ ফিরোজ আলম, যুবরাজ ও ন্যাশনাল আমীর মাওঃ আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী।

আরো উপস্থিত ছিলেন মাওঃ নুরুল আমীন, মতিউর রহমান, মাওঃ আমীর হোসেন, শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম,কামরুজ্জামান, সাবেক উপজেলা আবু সাইদ, সাবেক সভাপতি মনজুর আলম, সাইফুল ইসলাম মন্টি প্রমুখ।

ইনিউজ ৭১/টি.টি. রাকিব

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

দৈনিক যুগের আলো

জাতীয় বাংলাদেশ রাজনীতি অর্থনীতি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কৃষি

আন্তর্জাতিক মানের পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী

Abdus Sabur Razeeb

আন্তর্জাতিক মানের পবিত্র কোরআন প্রদর্শনী

ঢাকার বকশী বাজারস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাসব্যাপী বহু ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়. এটি চলবে আগামী ১০ মে ২০১৯ পর্যন্ত। প্রথম বারের মতো পবিত্র কোরআনের ৬০টি ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদর্শনীর আয়োজন করে আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। এটি দি সপ্তাহে পবিত্র কোরআনের বিরল এক প্রদর্শনী। এছাড়া আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি ভাষায় সম্পূর্ণ কোরআন অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা প্রিন্টিং পর্যায়ে আছে।

এ বিষয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের জাতীয় আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান বলেন, "পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে চলেছে। ভাষাবিদদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৫০০০ ভাষায় মানুষ কথা বলে থাকে। বর্তমানে আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রায় ১০০ ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ। এছাড়া আরো অনেক ভাষায় অনুবাদের কাজ চলমান আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বীগণ এই অনুবাদ পড়ার পর ইসলাম সম্বন্ধে তাদের ভুল ধারণা দূর হয়েছে, এমনকি বহু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এর প্রভাবে নিজ থেকে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমরা চাই, প্রতিটি ভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে দিতে। আমরা এবার ৬০টি ভাষায় অনূদিত কোরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যেকেউ এসে আন্তর্জাতিক মানের এ কোরআন প্রদর্শনী থেকে উপকৃত হতে পারেন।"

এ প্রদর্শনী দেখতে আসা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। আহমদিয়া মুসলিম জামাত এ প্রদর্শনীর পদক্ষেপকে কোরআনের গুরুত্ব উপলব্ধি ও এর প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার এক মহাসুযোগ হিসেবে মনে করছে। প্রদর্শনীতে বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবি, জুলা, নেপালি, ওড়িয়া, ইতালি, কিকামবা, কাটালান, উজবেকিস্তান ভাষা সহ মোট ৬০টি ভাষায় অনুবাদকৃত কোরআন প্রদর্শিত হচ্ছে। কোরআনের পাশাপাশি রয়েছে ইসলামী বিভিন্ন পুস্তকের সমাহার।

ঠিকানা: আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্র ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১২১১

সময়: প্রতিদিন ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

আপনার মতামত লিখুন।

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.
VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 14th Issue

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

31st January, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)